মুখপত্র

"জয় গৌরনিত্যানন্দ"

শ্রীগৌরধামগত আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীহরিদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার সম্পাদিত "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে তাঁহার নিজ লিখিত "সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী" মহারাজের জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৩৫২ সালের পৌষ মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে তিনি আমাদিগকে ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া নিজাভিষ্ট ধামে গমন করেন। শেষ জীবনে দৈহিক অপটুতার জন্য তিনি আর লেখাপড়ার কাজ করিতে পারিতেন না। কেবল "হা গৌরাঙ্গ গুণনিধে!—হে বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ। এইবার আমায় দয়া কর" এই আর্ত্তিবাক্য বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন। তাঁহার প্রাপ্তির প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়।

পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদে ও সিদ্ধবাবার অহৈতুকী কৃপায় "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" মাসিক পত্রিকা হইতে বাবাজি মহাশয়ের জীবনী যাহা মাসে মাসে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা একত্রে গ্রথিত করতঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে পারায় নিজেকে কৃত কৃতার্থ বোধ করিতেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে পত্রিকায় কতকগুলি 'বিষয় যাহা লিপিবদ্ধ ছিল না তাহা সংযোজিত করিয়া দিলাম। এই সংযোজনা কার্য্যের জন্য পিতৃদেবের নিজলিখিত ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যৎসামান্য পরিবর্দ্ধন ও তদসহ পুর্ব্বের মুদ্রণ ত্রুটির জন্য তুই একস্থানে পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি। তজ্জন্য আমার পরম পূজ্য অদোষদরশী শ্রীপিতৃচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। উল্লিখিত সংযোজিত ঘটনাবলীর বিবরণ গ্রন্থ মধ্যে যথাস্থান সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও পাঠকগণের দৃষ্টি

আকর্ষণের জন্য ঘটনাগুলির শিরোনামা এবং ও উহা প্রাপ্তির সূত্র নিম্নে পর্য্যায়ক্রমে দিলাম ঃ—

১। শ্রীধামপ্রাপ্ত শ্রীহরিদাস বাবাজি মহাশয়ের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন গ্রন্থের 'সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহারাজ' নামক প্রবন্ধ হইতে ঃ—

(ক) 'শ্রীজগদীশ মৈত্রের অপরাধ ভঞ্জন' (খ) ভীমের আত্মগ্লানি ও পরে অলৌকিক দর্শন'

২। শ্রীপাট শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী" মাসিক পত্রিকা হইতে ঃ—

(ক) সিদ্ধ বাবার স্বহস্ত লিখিত 'গোরা' নামাক্ষরের ব্লক। (খ) সিদ্ধবাবার রচিত ও স্বহস্তে লিখিত 'শ্রীশ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর ভাব বিচার' নামক বাংলা কবিতা। (গ) সিদ্ধবাবাকৃত নিজ হস্তে লিখিত সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীমদগৌরাঙ্গ নামের সপ্তবিংশতি নামামৃত স্তোত্র, (ঘ) সিদ্ধবাবার নিজকৃত ও নিজ লিখিত বাংলায় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রত্যঙ্গ বর্ণন" নামক কবিতা এবং (ঙ) শ্রীধাম বৃন্দাবনেও সিদ্ধবাবার সমাধি।

৩। শ্রীশ্রীবাস অঙ্গনের সেবাইত আমার সোদর প্রতিম স্নেহাস্পদ প্রভুপাদ শ্রীনিমাই চাঁদ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রদত্ত ঃ—

(ক) "শ্রীনিত্যানন্দ বংশাবতংশ গৌরধামগত প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্নর সহিত সিদ্ধ বাবার মিলন প্রসঙ্গ," (খ) সিদ্ধ বাবা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহার ভাবধারানুযায়ী প্রভুপাদ নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্ন রচিত 'শ্রীবৈষ্ণবাচার দর্পন' গ্রন্থে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধুর্য্যময়-অষ্টকালীন স্মরণ মঙ্গল লীলা" (গ) "মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের জীবনীর উপর সিদ্ধবাবার প্রভাব"—

উপরোক্ত ঘটনা বিবরণী প্রাপ্তির জন্য কৃপাময় প্রাপকের নিকট আমার অকপট শ্রদ্ধা ও দৈন্য নিবেদন করিতেছি।

আমার আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য এইগ্রন্থ মুদ্রনের প্রতিবন্ধকতার বিষয় অবগত হইয়া জগৎ-কল্যাণের জন্য যে ভক্ত হৃদয়ে এই সিদ্ধ মহাত্মার জীবনী প্রচার শুভেচ্ছার উদয় হইয়াছে সেই পরম বৈষ্ণবের জন্য শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দের চরণে মঙ্গল কামনা করি।

পরিশেষে নদীয়া বিনোদিয়া নাগরেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সিদ্ধবাবা দিবানিশি বিলাস বৈভবে বিভোর থাকিতেন সেই ধামেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের বর্ত্তমান পরিচালক কমিটি "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সমিতি" কে দুই হাজার পাঁচশত কপি "সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি" গ্রন্থসহ শ্রীগ্রন্থের সমুদয় সত্ত্ব অর্পন করিলাম। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সমিতি এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থের জন্য একটি পৃথক তহবিল রাখিবেন এবং সেই তহবিল হইতে এই গ্রন্থের পুনঃ মুদ্রণ এবং শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির সংলগ্ন সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহারাজের ভজন কুটীর সংস্কার বা মেরামতি কার্য্য করিতে পরিবেন।

এই প্রকারে যাহাতে শ্রীগ্রন্থকে চিরকাল বজায় রাখিয়া সিদ্ধবাবার আদেশ প্রচারিত করা যায় এবং গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ মূল্যের দ্বারা সিদ্ধবাবার সমাধি মন্দির সংস্কার করা যায় এই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া উপরোক্ত সর্ত্তে আমি গ্রন্থসহ গ্রন্থের সত্ত্বাধিকার উক্ত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সমিতিকে অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

সিদ্ধ বাবার শ্রীচরণে আমার ভূলুণ্ঠীত দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করিতেছি। ইতি।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপা প্রার্থিনী—

শ্রীসুশীলাসুন্দরী দেবী (ভক্তি সরস্বতী)

সিদ্ধবাবার তিরোভাব তিথি ঃ—

পূর্ণিমা—১৪ই পৌষ, ১৩৭০।

ভূমিকা

গৌরাগতপ্রাণ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজি একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন,—ইহা বোধহয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবিদিত নয়। তাঁহার শ্রীমুখের বাণি একটিও বিফল হইয়াছে, ইহা আমরা কাহারও মুখে শুনি নাই। বাল্যকালে আমরা তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি এবং প্রাচীন লোক-দের মুখেও শুনিয়াছি, চৈতন্যদাস বাবাজি সত্যই একজন লক্ষণাক্রান্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার ভজন সাধন, আচার ব্যবহার, সম্প্রদায়সিদ্ধ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের ন্যায়ই ছিল, তবে তাহার মধ্যে একটু নূতনত্বও ছিল। ভজন সাধনে বা আচার ব্যবহারে নূতন প্রণালী অর্থাৎ স্বকপোলকল্পিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, অনেকেই শিহরিয়া উঠেন সত্য, কিন্তু ইহাতে শিহরিয়া উঠিবার মত কোন অঘটনঘটনা নাই। নূতনত্বের অর্থ, প্রাচীনেরই একটা নূতন ব্যাখ্যা মাত্র কোন নূতন গ্রন্থ নয়। নূতনগ্রন্থ হইলে মহাকবি কালিদাসের উক্তির ন্যায় একটা মুখবন্ধের ঘটাও থাকিত। কবি বলিয়াছেন ঃ—

পুরাণমিত্যেব ন সাধুসর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্॥

পুরাতন সবই ভাল, নূতন সবই মন্দ, তাহা নয়। পুরাতন প্রিয়দিগের নিকট নূতনের পরাজয় যদিও স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু নূতন ব্যাখ্যাকারের প্রতি কেহই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, বরং তাহাতে আদরের মাত্রাই অধিক দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের বর্ণিত বাবাজি মহারাজের জ্ঞানগত ব্যবহারে যে একটু নূতনত্ব শুনা গিয়াছে, তাহাতে পুরাতনের ঔজ্জল্য নষ্ট হয় নাই বরং বর্দ্ধিতই হইয়াছে, কাজেই তাহাতে কাহার অসন্তোষের তেমন একটা কারণ প্রকাশ পায় নাই।

গোপীভাবের ভজনে যাঁহারা আত্মনিমজ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা পুরুষ বলিয়া কখনও আত্মাভিমান করেন না, তাঁহাদের নিকট পুরুষ

একমাত্র সেই পুরুষোত্তম, তাঁহাদের আত্মা সেই পুরুষোত্তমের সেবিকা মাত্র। চৈতন্যদাস বাবাজিও সেই গোপীভাবের ভক্ত। তাঁহার আত্মাও সেই ভগবৎসেবিকার পদেই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্র লইয়া তিনি কখনও কখনও দর্শনার্থে আগতা রমণীগণের নিকট হইতে বলয়াদি ভূষণ চাহিয়া লইতেন, তাহা নিজ অঙ্গে স্থাপন করিয়া সেই পলিতকেশ, গলিতদন্ত, শ্লথচর্ম্ম, জরাক্লিষ্ট কলেবরটিকে রমণীর ন্যায় বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়া মহাপ্রভুর মন্দিরে গমন করিতেন, কত আত্মনিবেদন শ্রীবিগ্রহের নিকট প্রকাশ করিতেন! মহাপ্রভুর অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দন্তহীন মুখে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেন। "নদীয়া নাগরীর" ভাবে নবদ্বীপবাসিনী "গৌর-গরবিনী" যুবতীর আবেশে আত্মহারা হইয়া ভুবনমোহন শ্রীশচীনন্দনের নিকট কত রতিরসের অভিভাষণ করিতেন। কোনও রসিক বৈষ্ণব তাঁহার এই ভাব দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে "আমি যে গৌরভাতারী গো" বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। পরিচয় দানের সময় দুনয়ন বহিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইত, সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিত। "গৌর ভাতারী" কথাটা নিতান্ত গ্রাম্য হইলেও উহার ভাবটা গ্রাম্য নয়। উহাতে আধ্যাত্মিকতার বিমল জ্যোতি সুস্পষ্টভাবে বিরাজিত আছে। "গৌরভাতারীর" সাধুভাষা "গৌরভর্ত্তৃকা" অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই যাহার ভর্ত্তা, পতি প্রাণবল্লভ। দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "যিনি জগৎ ভুলিয়া, জাতিকুল ভুলিয়া ধনজন ভুলিয়া, সাধনামৃতপানে আত্মার নশ্বরত্ব ভুলিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সাধনের ধনকে নিজের প্রাণবল্লভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই গৌরভাতারী বা ভর্ত্তৃকা বলিয়া আত্মপরিচয় দিবার অধিকারী। পাঠক! সংসারের ক্রীতদাস তুমি আমি সে পরিচয়েরযোগ্য হইতে পারি না। এই নূতনত্ব তাঁহার জীবনলীলায় আমরা দেখিতে ও শুনিতে পাইয়াছি। যদি তার্কিক বৈষ্ণবমণ্ডলী বাবাজি মহারাজের এই ভাবের বিরুদ্ধে একটু

তর্কের অবতারণা করিতে চান, তাহাতে অবশ্য "আসল গৌরভাতারী" ভীত হইবেন না, নকলের ভয় পদেপদে, ইহা পাঠকই চিন্তা করিয়া দেখিবেন। তার্কিকের তর্ক এই, যদি "আরাধ্যা ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়ঃ"ই হ'ন, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই যদি বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য হয় আর শ্রীচৈতন্যবীথি-পথিকগণের যদি শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম হয়, তবে আবার "গৌরভাতারী"দের এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠিল কেন? "গৌরভাতারী"র গৌরচন্দ্রিকা এই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে একটু ললিত-ভৈরবের ঝঙ্কার দিয়া বলিতেছেন,—ওহে গোপীভাবের সাধক! কৃষ্ণকে প্রাণপতি করিতে গেলে, যেমন গোপীভাবের আশ্রয় ব্যতি-রেকে পূর্ণমনোরথ হইতে পারা যায় না। নিজে গোপী না সাজিলে, স্বয়ং গোপী হইয়া গোপীযুথে প্রবেশ না করিলে গোপীনাথকে তো আত্মনাথ করা যায় না। এ শাস্ত্রের কথা, এসব দ্বাপরযুগের কথা, এসব বৃন্দা-বনের কথা, আজ কলিযুগের মানুষ তুমি কোন্ দৃষ্টান্ত হৃদয়ঙ্গম করিবে? বৃন্দাবনের সেই সেই লীলা, সেই বহু পুরাতন নন্দনন্দনের লীলারস নূতন করিয়া, হার্দ্দ্য করিয়া কোন্ দৃষ্টান্তের আশ্রয়ে বুঝিবে? বৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জেও যে রসমাধুর্য্য শ্রীব্রজগোপীগণ একা একা আস্বাদ করিয়াছেন, সেই মধুর রস, সেই ভজনামৃত জগৎকে আস্বাদন করাই-বার জন্য পূর্ণরসস্বরূপ শ্রীভগবান্ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির সহিত মিশ্রদেহ ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সাজিয়া ভুবনকে পবিত্র করিয়াছেন। এ অবতারের উদ্দেশ্য ব্রজলীলার পুনরাবৃত্তি মাত্র ব্রজে যে যে ভাবে ব্রজবাসীগণের মনোমোহিত হইয়াছিল, সেই ব্রজভাবানুগত প্রেমধন জগতে বিতরণ করিবার জন্য গৌরহরি নবদ্বীপে অবতীর্ণ। ইহা যদি সত্য হয়, তবে নবদ্বীপ নাগরীগণ গৌরভাবে গদ গদ হইয়া ব্রজভাবের, সেই গোপীভাবের আভাস বা গৌরচন্দিকা দেখাইবার জন্য গৌররূপে মনপ্রাণ মজাইয়া থাকেন, তাহা কি অন্যায় বলিতে হইবে? আর যদি শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত ভক্ত কোন মহাপুরুষ চারি-

শত বৎসরের সেই সব ঘটনার আবৃত্তি করিবার জন্য বা জগৎকে সেই সেই সুমধুর গোপীভাব শিখাইবার জন্য গৌরবিগ্রহেই তাদৃশ প্রেমানুরাগ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, তাহা কি শ্রীভজনের বহির্ম্মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে? বরং শ্রীভগবানে ঐকান্তিক আসক্তির অখণ্ড পরিচয় করিয়া জীবকে কৃতার্থ করা হইবে। আমি বলি এসব গৌরভাতারীদিগের প্রতি রোষকষায়িত কটাক্ষ নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদের মধুর ভজনের মধুরতা অনুভব করায় দোষ কি? শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজির নাগরীভাবে গৌর-ভজন এই ভাবের জিনিষ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শ্রীনন্দনন্দনে ও শ্রীশচীনন্দনে অদ্বয়তত্ত্ব এক ভাবেই দেখিতেন, এক বিগ্রহে যুগলরূপ দর্শন করিতেন, তাই তিনি ব্রজের ভাবে উন্মত্ত হইয়া গোপীভাবেরই আভাস মাত্র নদীয়ানাগরীর ভাব ধরিয়া শ্রীগৌরবিগ্রহে শ্রীরাধাবল্লভের উপাসনা করিতেন। ইহা প্রাচীন পদ্ধতি নয় বলিয়া যদি কেহ এরূপ ভজনের বিরুদ্ধে দণ্ড ধারণ করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের দৃষ্টি আমি প্রাচীন পদাবলীর দিকে একটু আকৃষ্ট করিতে চাই। গৌরচন্দ্রিকা নামে যে সব প্রাচীন পদাবলী পূজ্যপাদ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতির বিরচিত পদাবলীর অনুসরণ করিয়াছেন, সেই সব পদাবলীতে নদীয়ানাগরীর ভাব অনেক স্থলেই উল্লেখ আছে ইহা বোধহয়, বৈষ্ণব মহাত্মারা উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। সে সব স্থলে নদীয়ানাগরীর ভাবকে গোপীভাবের আভাস না বলিয়া কেহই থাকিতে পারেন না। শ্রীগোপীভাবই যে নদীয়ানাগরীর ভাব, ইহা স্বীকার না করিলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজন সাধন অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। তবে বলিতে পারেন ভজনগিরির উচ্চশৃঙ্গে যাঁহারা আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; যাঁহারা ভগবদ্ভাবে আত্মহারা তাঁহারাই শ্রীভগবানের সহিত ক্রীড়াকৌতুক ও রসবিস্তার করিবার অধিকারী। কিন্তু

যাঁহারা ভজনগিরিতে আরোহণ করিবার ইচ্ছুক, তাঁহাদের নিকট এরূপ আদর্শ ধরিয়া দিলে, তাঁহারাও সহজে ইহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। এইজন্য গোপীভাবের ভজনেও নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এমন বিশুদ্ধভজন অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া বিদ্যাসুন্দরের টপ্পায় পরিণত হইয়াছে। তাহা হইলে এসব নাগরী-ভাবের ভজনও ব্যক্ত করিবার বস্তু নয়। ইহা যাঁহাতে আছে, তাহাতেই থাকিবে, ইহাই মানিয়া লইতে হয়। পাছে ঐ সব আদর্শ অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া ভজনে কুফল প্রকাশ করে তজ্জন্য ভজনসিদ্ধ মহানুভব বৈষ্ণবগণ সাধন ভক্তির পরাকাষ্ঠা ছাড়িয়া দেন নাই। এক্ষেত্রে নাগরীভাব ধারণ করা কতদূর সঙ্গত, তাহা গৌরাঙ্গসেবকই বিচার করিবেন। আমি শুনিয়াছি এবং কিছু মনেও পড়ে, শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজির এই আদর্শ লইয়া "গৌরভাতারীর" প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহে লম্পট পুরুষের লক্ষণাদি প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহাতে বৈষ্ণবসমাজ অতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়চ্যুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই জন্য সেই দলের আকার অধিক পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই, অল্পেই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে চৈতন্যদাস বাবাজির আর দোষ কি ? তিনি যাচিয়া কাহাকেও বলেন নাই, যে ইহাই আমাদের ভজন। যিনি দেখাদেখি এই নাগরীভাবের পরিপোষণ করিয়াছিলেন, আমার বোধ হয়, তিনিও চৈতন্যদাস বাবাজির প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায় ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজের সৌভাগ্যবশতই সে সৌভাগ্যলাভে তিনি বঞ্চিতই হইয়াছিলেন। যাউক ও সব কথা ; এখন প্রকৃত কথার অনুসরণই কর্ত্তব্য। চৈতন্য দাস বাবাজি ভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়াই শেষ বয়সে এই নাগরীভাবের ভজনে আসক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাহাকেও তিনি নাগরীভাবে ভজন করিতে অনুরোধ করিতেন না। বালকের খেলার মত তিনি তাহা করিয়া যাইতেন। যাঁহারা সিদ্ধপুরুষ, তাঁহাদের শেষ জীবন

একটা খেলার মত হইয়া পড়ে। রামকৃষ্ণ পরমহংসও মধ্যে মধ্যে রমণীর ন্যায় বেশভূষায় সজ্জিত হইতেন, গোপী সাজিয়া গোপীজন-বল্লভকে হৃদ্দেশে দর্শন করিতেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে অন্যায় নয়, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এ গীতা উক্তির অধিকারী তাঁহারাই সত্য। তবে কখনও কখনও তরুণবয়স্ক নর-কে গোপীর বেশে সজ্জিত হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, তাহা কতদূর সঙ্গত, তাঁহারাই তাহা বলিতে পারেন কি না জানিনা। তবে সিদ্ধ পুরুষগণ ভাবে বিভোর হইয়া যখন যে ভাবে অবতীর্ণ হ'ন, তখন তাহাদের অন্তর বাহ্য সেই ভাবেই ভাবিত হইয়া যায়। যখন তাহারা নারী সাজেন, তখন তাহাদের অন্তর বাহির নারীই হইয়া যায়, বাহিরে নারী অন্তরে পুরুষ তাহারা থাকেন না। কিন্তু সকলে কি তাহাতে অধিকার লাভ করিতে পারে? চৈতন্যদাস বাবাজির নাগরী-ভাবে পুরুষ ভাবের লেশ মাত্রও থাকিত না ইহাই সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ। অসিদ্ধ সাধকের অন্তর বাহির এত সংযত হয় না। ভজনে সিদ্ধিলাভ একবার হইয়া গেলে, ভজনের 'বুনিয়াদ' একবার পাকা হইয়া গেলে, পতনের সম্ভাবনা আর থাকে না, কিন্তু অপক্ক অবস্থায় এ সব ভাব আনিতে গেলে হাস্যাস্পদ হয় না কি? গোপীভাব বা নাগরীভাবের ভজনে প্রবৃত্তি থাকিলেই যে হঠাৎ তাহাকে অধিকার করা যায়, এরূপ আশা করাই অনুচিত। তবে সেই ভজনে যাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে, যাঁহার অন্তর সেই সেই ভাবে বিভোর হইয়াছে, যাঁহার অন্তর বাহির এক হইয়া গিয়াছে, তিনি ভাবনার অনুরূপ বেশ ধারণ করিলে তাঁহাকে কেহ নিন্দা করিবেন না, বরং তাঁহার তাদৃশ রুচিতে লোক আনন্দ অনুভবই করিবে। কাজেই নদীয়ানাগরী ভাবকে আমরা ঠেলিয়া ফেলিতে পারি না। প্রাচীন গোপীভাব শিক্ষার একটি আদর্শ মাত্রই নদীয়ানাগরীভাব। শ্রীভগবানের ভুবন-মোহন রূপে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ভুলিয়া ছিল, রূপতৃষ্ণায় লোলুপ

বিলাসবাসনায় বিবশ, নরনারী কেন তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন করিবে না? ভগবান্ যখন গৌররূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মধুর ভাবের ভক্তগণ কেহই দূরে ছিলেন না। যাঁহারা গৌর-রূপে প্রাণমন মজাইয়া ছিলেন, তাঁহারাও যে সামান্য নরনারী, তাহাও ভাবিতে আশঙ্কা হয়। গোরারূপ যে সব নদীয়া নাগরীর মনপ্রাণ হরিয়াছিল, তাঁহারও শ্রীভগবানের নিত্য-সেবিকা। সেই নিত্য-সেবিকাগণের ভাবকদম্বে যাঁহার মনোরাজ্য সুবাসিত, তিনি সমা-লোচককে ভয় করিবেন কেন? তিনি নিজের ভাবে ভগবানকে ভজিবেন, তাহাতে পর-মুখাপেক্ষা নাই। তবে আমার বক্তব্য এই যাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পাঁচজনে জানে, যাঁহার জীবন সংসারের খুঁটিনাটির জন্য ব্যস্ত নয়, সর্ব্বদা ভজনানুরাগ যাহার অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছে, কামিনী-কাঞ্চনের লালসা ক্ষণকালের জন্যও যাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারে না, তাদৃশ ভক্তের আচরণে কোনরূপ কটাক্ষ করিলে অপরাধ হয়, তাই বলি ভাই! শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজির মত "গৌরভাতারী"কে দেখিয়া মনে কোন দ্বিধা করিও না, বিশুদ্ধ মনে তাঁহার কৃপাভিক্ষায় লালায়িত হইয়া প্রার্থনা করিও, তাঁহাদের পঞ্চ-ভৌতিক দেহ অদৃশ্য হইলেও তাঁহারা অলক্ষ্যে থাকিয়া জগজ্জীবকে কৃপাবর্ষণ করেন। "জয় গৌরনিত্যানন্দ!"

শ্রীহরগোবিন্দ শিরোমণি

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি।

শ্রীধাম নবদ্বীপের সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেই জানেন! শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে তিনি থাকিতেন এবং তিনি শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভকে মধুর ভাবে ভজনা করিতেন। যিনিই শ্রীধামে গিয়াছেন, যিনিই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, তিনি এই শ্রীবৈষ্ণব-বিগ্রহটিকে দর্শন না করিয়া ফিরেন নাই। যিনি তাঁহার সহিত একটি মাত্র কথা কহিয়াছেন, তাঁহাকে একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন ক্ষণমাত্র তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পরম পবিত্র শ্রীমূর্ত্তিটি জীবনে কখন ভুলিতে পারেন নাই, এই শ্রীবৈষ্ণব বিগ্রহটির শ্রীমূর্ত্তিটি তাঁহার হৃদয়ে যেন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। ইহা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তির মত, তাঁহার ধ্যানের বস্তু হইয়াছে। এমনি প্রভাব ছিল,—সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজির পরম পবিত্র শ্রীমূর্ত্তির,—তাঁহার প্রেমময় প্রকৃতির—এমনি মহাত্ম্য ছিল তাঁহার পরম প্রবিত্র ধর্ম্মজীবনের,—এমনি প্রভাব ছিল তাঁহার সহিত ক্ষণিক সঙ্গের,—তাঁহার শ্রীমুখের একটি কথার। কি ভক্ত কি অভক্ত, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি দরিদ্র কি ধনী, সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিবার অপূর্ব্ব শক্তি ছিল,—এই সিদ্ধ মহাপুরুষ, এই গৌড়ীয় সিদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজিটির। আজ প্রায় ৮৬ বৎসর গত হইল, এই শ্রীবৈষ্ণব-বিগ্রহটি শ্রীধাম নবদ্বীপ অন্ধকার করিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, নিত্যধামে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পুণ্য ও পবিত্রতম স্মৃতিসকল সর্ব্বলোকের মনে অদ্যাবধি জাগরুক রহিয়াছে। তাঁহার পুণ্য চরিতকথা, ঈশ-কথা; কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ভক্তচরিত-কথা এবং ভগবতকথা এতদুভয়ই ঈশ-কথা বলিয়া

প্রোক্ত হইয়াছে। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির পুণ্য চরিতকথা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আত্মশোধনের জন্য তাহা ক্রমশঃ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব।

পূর্ব্বাশ্রমের বৃত্তান্ত। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের গোয়ালন্দ ষ্টেসনের ১২ মাইল উত্তর পূর্ব্বে পদ্মানদীর অপর পারে ভাদরা গ্রামে ১১৭৫ সালে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি জন্মগ্রহণ করিয়া এই গ্রাম ও তাঁহার পিতৃমাতৃকুল পবিত্র করেন। এই গ্রামটি মৈমনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত। বহু সজ্জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের এখানে বাসস্থান ছিল। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি এই গ্রামের প্রসিদ্ধ বঙ্গজ কায়স্থ ঘোষবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগ্যবান্ পিতামহের নাম ছিল গোবিন্দনাথ ঘোষ রায়। ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ মুরশিদাবাদের নবাবসরকারে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব সরকার হইতে ইহারা "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। গোবিন্দনাথ ঘোষ-রায় মহাশয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি "শ্রীগোবিন্দরায়" নামে এক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভাদরা নিবাসী গোস্বামী প্রভুদিগের হস্তে শ্রীবিগ্রহের সেবাভার অর্পণ করেন। এই সঙ্গে ১২৫ বিঘা আটিয়া পরগণার নিষ্কর ভুমিও দান করেন। অদ্যাবধি ভাদরার গোস্বামীগণ তাঁহাদিগের নিজের শ্রীশ্রীমদনমোহন শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রীশ্রীগোবিন্দরায় শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেছেন এবং নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেছেন।

গোবিন্দনাথ ঘোষ রায়ের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ বৈদ্যনাথ কনিষ্ঠ গৌর নাথ। পিতার দেহত্যাগ হইলে কনিষ্ঠ পুত্র গৌরনাথ তাঁহার পদে আটিয়া পরগণার মুসলমান জমিদারের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। জ্যেষ্ঠপুত্র বৈদ্যনাথ গৃহে থাকিয়া পূর্ব্বপুরুষের ভাদরা গ্রামের সম্পত্তি রক্ষা করিতেন। এই বৈদ্যনাথ ঘোষ রায়ের এক মাত্র পুত্র সন্তান হয়, তাহার নাম জগবন্ধু,—আর এই জগবন্ধুই আমাদের পুজ্য-

পাদ সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয়। জগবন্ধুর মাতা তাঁহার শৈশবাবস্থায় পরলোক গমন করেন। স্ত্রী শোকে বৈদ্যনাথও ইহার কিছু দিন পরে পরলোক গমন করেন। সুতরাং শিশু জগবন্ধুর লালন পালনের ভার তাঁহার পিতৃব্য গৌরনাথ রায় ও তাঁহার ভক্তিমতী সহ-ধর্ম্মিনীর উপর পতিত হয়। গৌরনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। জগবন্ধুকে পাইয়া তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে পরমানন্দে তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষ লালন পালন করিতে লাগিলেন। গৌরনাথ পরম গৌরভক্ত ছিলেন।

বাল্যলীলা-কাহিনী। কথিত আছে যখন জগবন্ধুর বয়স ৭ বৎসর মাত্র, তখন তিনি প্রবল বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার জীবনের কিছু মাত্র আশা ছিল না, চিকিৎসকগণ একবাক্যে তাঁহাকে জবাব দিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া সকলেই কাঁদিতেছেন, এমন সময়ে গৌরভক্ত গৌর নাথ ঘোষ রায় মহাশয় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "আহা! আমার নিকটেই ঔষধ রহিয়াছে, তাহা আমি সোনার বাছাকে দিলাম না।" এই বলিয়া উপস্থিত আত্মীয়স্বজনকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি দৌড়িয়া গিয়া গোস্বামী প্রভুদিগের সেবিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহের চরণামৃত আনিয়া জগবন্ধুর মুখে দিলেন, মস্তকে ও বক্ষে মাখাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ জগবন্ধুর জ্ঞান হইল, তাঁহার স্পন্দনহীন শরীরে চেতনা আসিল। সকলে দেখিয়া বিস্ময়ভাবে কহিলেন "কি আশ্চর্য্য এই ঔষধের গুণ! ইহাতে মৃতদেহ সজীব হইল!" দুই একদিনের মধ্যে বালক জগবন্ধু ব্যাধিমুক্ত হইলেন। শ্রীভগবত-চরণামৃতের অপূর্ব্ব প্রভাব এবং গৌরনাথ ঘোষ রায়ের অপূর্ব্ব ভক্তি ভাব দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই জগবন্ধু পরম হরিভক্ত হইলেন। বালক জগবন্ধু এক্ষণে হরিনামে মত্ত হইলেন। হরিনামে তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রসাদে তাঁহার অপূর্ব্ব

বিশ্বাস হইল, তিনি জলখাবারের পয়সা পাইলে বাতাসা কিনিয়া হরির লুট দিতেন। অনিবেদিত কোন বস্তু গ্রহণ করিতেন না। বালক জগবন্ধুর হরিসঙ্কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব ভাব হইত। বালক জগবন্ধু এক্ষণে গ্রামবাসীর প্রাণ স্বরূপ হইলেন।

শিক্ষা। জগবন্ধুর শিক্ষার জন্য গৌরনাথ ঘোষরায় মহাশয় তাঁহার নিজ বাটীতে একজন উপযুক্ত মুন্‌সীকে শিক্ষক রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট জগবন্ধু অতি অল্প দিনের মধ্যেই বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় উত্তম ব্যুৎপন্ন হইলেন। তখন তাঁহার বয়ক্রম ১২।১৩ বৎসর মাত্র। তিনি পাঠ্যাবস্থায়ও হরিনাম ও হরিসঙ্কীর্ত্তন ছাড়েন নাই। তিনি প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী পাঠে ও কীর্ত্তনে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।

ধর্ম্ম-পিপাসা। জগবন্ধুর পূর্ব্বপুরুষ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিতেন। বালক জগবন্ধু শিশুকাল হইতেই হরিনামে মত্ত, বুদ্ধি বৃত্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভাদরা গ্রামে অনেক শাক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ছিলেন। তাঁহারা বালক জগবন্ধুকে শক্তি উপাসনার উপদেশ দিতেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম"। বালকের মুখে এই উচ্চতত্ত্বকথা শুনিয়া সকলেই চমকিত হইতেন। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইলেই বালক জগবন্ধু নির্ভয়ে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের পোষকতা করিতেন।

সন্ন্যাসী ও জগবন্ধু। রায় মহাশয়দিগের বাটীতে অতিথিসেবা ছিল, এই জন্য মধ্যে মধ্যে অতিথি অভ্যাগত সাধু সন্ন্যাসী প্রায়ই আসিতেন। একদিন ভাগ্য ক্রমে একজন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী জগবন্ধুর গৃহে আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করিলেন। জগবন্ধুর ধর্ম্মপিপাসা প্রবল ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি এই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর নিকট শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসু হইলেন। সাধু বৈষ্ণবটি

মহানন্দে বালককে বুঝাইলেন "পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই উপাস্য। কেবল পুরুষ উপাস্য হইতে পারেন না, কারণ তিনি নির্গুণ ও নির্লিপ্ত, নির্গুণের উপাসনা অসম্ভব। আবার কেবল প্রকৃতিও উপাস্য হইতে পারেন না, কারণ তিনি গুণময়ীও অচৈতন্যা। পরমপুরুষ যখন প্রকৃতি সমালিঙ্গিত হন, তখনই তাঁহার সগুণাবস্থা, তখনই তিনি উপাসনার যোগ্য। তাই পরম দয়াল পরম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান জীবের দশা মলিন দেখিয়া জগতের হিতার্থে পুরুষ ও প্রকৃতি একাত্মা হইয়া "অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রূপে, অর্থাৎ নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে এই গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে"। এই কথা শুনিয়া জগবন্ধু প্রতিদিন শুদ্ধাচারে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থ নিত্য পাঠ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার বয়ক্রম ১৩।১৪ বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়স হইতেই সাধু বৈষ্ণবের কৃপায় তিনি এইরূপে বৈষ্ণবধর্ম্মের এবং তাঁহার উপাস্যদেব শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সারতত্ত্ব বুঝিয়া ফেলিলেন।

গৃহত্যাগ। এখন হইতেই তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য-ভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার পিতৃব্য গৌরনাথ ঘোষ জগবন্ধুর ভাব গতিক দেখিয়া তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য একটি পরমা সুন্দরী পাত্রী স্থির করিলেন। বিবাহের আয়োজন সকলি ঠিক হইয়া গেল। জগবন্ধুর মন সংসারে বদ্ধ হইতে চাহিল না, তিনি বিবাহের পূর্ব্ব দিন রাত্রিযোগে গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন। গৌরনাথের গৃহে হাহাকার পড়িয়া গেল। বহু অনুসন্ধানেও জগবন্ধুর সমাচার না পাইয়া গৌরনাথ তাঁহার একজন বিশ্বাসী ভৃত্যকে শ্রীধাম নবদ্বীপে পাঠাইলেন।

জগবন্ধু নবদ্বীপে। এই লোকটি নবদ্বীপে আসিয়া জগবন্ধুকে যে বেশে দেখিল, তাহাতে তাহার বুক ফাটিয়া গেল। এখন জগবন্ধু করঙ্গ, কন্থা, কৌপীনধারী নবীন বৈরাগী। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমময়

ভাব এবং তেজপূর্ণ প্রশান্ত মুর্ত্তি দেখিয়া ভৃত্যটি তাঁহাকে আর কিছু বলিতে পারিল না ; সে দেশে ফিরিয়া গিয়া গৌরনাথ ঘোষকে সকল কথা কহিল। গৌরনাথ শ্রীধামে আসিলেন, অনেক অনুনয় বিনয় ভালকথা বলিয়াও জগবন্ধুকে গৃহে লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি দুইতিন বার নবদ্বীপে এইজন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। জগবন্ধুর ভেকের নাম হইল চৈতন্য দাস। এখন হইতে আমরা তাঁহাকে এই নামেই অভিহিত করিব। ইহা ১১৯০ সালের কথা।

চৈতন্যদাসের নবীন বয়স, লাবণ্যময় বপু, পরিধানে বহির্বাস, কণ্ঠে বড় বড় তুলসীর মালা, প্রশস্ত ললাটে সুদীর্ঘ তিলক, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত, বদনে সদাই "হা বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!" এই অপূর্ব্ব নবীন বৈষ্ণব বিগ্রহটিকে দেখিয়া এবং তাঁহার বৈষ্ণবোচিত দৈন্যভাবে মোহিত হইয়া, শ্রীধামবাসী প্রাচীন বৈষ্ণব সাধকগণ তাঁহাকে প্রাণতুল্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কোমল স্বভাব, সুধামধুর ভাষ, সরল বিনীত ও সলজ্জভাব, নৈষ্ঠিক আচরণ এবং নদীয়াবাসীর প্রতি তাঁহার অকপট প্রীতি দেখিয়া নদীয়াবাসী সর্ব্বলোকে তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে তাঁহার প্রায় সর্ব্বক্ষণ স্থিতি। প্রভুর সেবাইত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার সকল গোস্বামীপাদ-গণের তিনি প্রিয়পাত্র হইলেন। মা গোস্বামিনীগণও তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে আদর করিয়া প্রসাদ দিতেন। চৈতন্যদাস শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার-পরিবার গোস্বামীপাদদিগের পুত্রকন্যাদিগেকে বড় ভালবাসিতেন। নদীয়া-বালিকাগণ তাঁহার বড় প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের দেখিলেই তিনি প্রণাম করিতেন। তাঁহার মনে কি ভাব উদয় হইত, তখন তাহা কেহ জানিতে বা বুঝিতে পারিতেন না। শ্রীমন্দিরে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নয়নে তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীবদনচন্দ্র দর্শন করিতেন। মধ্যে মধ্যে "হা

বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর !" এই শব্দটি মাত্র শ্রুত হইত। নবানুরাগে নবীন বাবাজি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমে গরগর থাকিতেন। যেখানে ভাল ফুল পাইতেন, তুলিয়া আনিয়া প্রভুর জন্য শ্রীমন্দিরে বসিয়া সুন্দর মালা গাঁথিতেন, আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের বদনচন্দ্রের প্রতি এক একবার সপ্রেম নয়নে চাহিতেন। ইহা যদি কেহ দেখিত, লজ্জায় বদন অবনত করিতেন। তাঁহার ভাবটি নবানুরাগিনী নবীনা নদীয়া-বালার ন্যায় সলজ্জ এবং মধুময়। মালাগাঁথা হইলে তাহা হাতে করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতেন। গোপনে কোন প্রভু-সন্তানকে দিয়া বলিতেন "এই মালাগাছটি প্রভুর গলদেশে পরাইয়া দিন, আমি এখানে দাঁড়াইয়া দেখি, কেমন তাঁর শোভা হয়"। এই ভাবে দুই বৎসর গেল।

শ্রীবৃন্দাবন গমন। ইহার পর তিনি তাঁহার গুরুদর্শনে শ্রীধাম বৃন্দাবন গমনের সংকল্প করিলেন। তাঁহার মনের সংকল্প শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াবল্লভকে জানাইলেন। প্রত্যাদেশ পাইলেন "শ্রীবৃন্দাবন যাও, গোবিন্দ গোপীনাথ দর্শন কর, কিন্তু নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিও। তোমার স্থান নবদ্বীপে।" চৈতন্যদাস বাবাজির সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে মনে দ্বিধা হইল। তিনি মনে মনে চিন্তিত হইলেন, কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করিলেন না। তিনি উভয় শঙ্কটে পড়িলেন, শ্রীগুরুদর্শনের জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, এদিকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভকে ছাড়িয়া,—নবদ্বীপ ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে মন সরিতেছে না। পুনরায় তিনি প্রত্যাদেশ পাইলেন "যাও, কিন্তু বেশী দিন সেখানে থাকিও না"। এইবার চৈতন্যদাস বাবাজি কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে চৈতন্যদাস। চৈতন্যদাস বাবাজির দীক্ষাগুরু কে, তাহা সঠিক কেহ বলিতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীঅদ্বৈত পরিবারভুক্ত শ্রীউৎসবানন্দ গোস্বামী, মতান্তরে

বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীজীয়ড়নৃসিংহ বরাটের নিকট হইতে রামতনু মুখোপাধ্যায় ভাগবতভূষণের বলাগড়স্থ নিবাসে তাঁর দীক্ষা হয় এবং ভেকের শ্রীগুরুদেবের নাম শ্যামানন্দ। ইনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী,—উদাসীন। তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রাণধন। চৈতন্যদাস বাবাজি যখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন, সেই সময়ে তাঁহার গুরুদেব সেখানে ছিলেন। গুরুশিষ্যে মিলন হইলে অপূর্ব্ব প্রেমের তরঙ্গ উঠিল। নির্জ্জনে বসিয়া গুরু শিষ্যে গৌরকথায় রাত্রিদিন কাটাইলেন। চৈতন্যদাস বাবাজি শ্রীধাম বৃন্দাবনে ৩।৪ বৎসর কাল বাস করিয়া গুরুসেবায় তাঁহার ইষ্টদেবকে প্রীত করিলে তাঁহারই আদেশে তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কথিত আছে তাঁহার পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় তিনি ব্রজের ভজন ছাড়িয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া মধুরভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন করিতে আরম্ভ করেন। চৈতন্য দাস বাবাজির শ্রীবৃন্দাবন ভাল লাগিল না, ব্রজের ভজনে মনের তৃপ্তি হইল না। ৩।৪ বৎসর কাল তিনি শ্রীগুরু সন্নিধানে থাকিয়া গুরুর আদেশে, শ্রীগৌরাঙ্গ-নাগরের মধুর ভজনের উপদেশ লইয়া,—নদীয়ানাগরীভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিলেন। তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে "প্রিয়াজি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে "প্রিয়াজিবল্লভ" বলিয়া ডাকিতেন। কখন কখন "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ"ও বলিতেন।

শ্রীনবদ্বীপে পুনরাগমন। শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্য দাস বাবাজি তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমন্দিরেই স্থান পাইলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার গোস্বামীপাদগণ তাঁহাকে অতি সমাদরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাঙ্গনের একটি কক্ষে স্থান দিয়া প্রত্যহ প্রসাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এক্ষণে পরমানন্দে চৈতন্যদাস বাবজি সর্ব্বক্ষণ শ্রীমন্দিরে থাকিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রেমসেবা

করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভজনপ্রণালী তখন পর্য্যন্ত কেহ জানিতেন না। তিনি গোপনে তাঁহার নদীয়ানাগর শ্রীগৌরসুন্দরকে নাগরীভাবে ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকে দেখিত চৈতন্য দাস যেন মাটির মানুষ,—স্ত্রীলোকের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বদা সলজ্জভাব। গঙ্গাস্নানে গিয়া তিনি স্ত্রীলোকের ঘাটে নামিয়া স্নান করিতেন, দুষ্ট লোকে কত কি বলিত, তিনি অপরাধীর ন্যায় করযোড়ে ক্ষমা চাহিতেন।

"একদিন সিদ্ধ বাবা গঙ্গা স্নান করত তীরে উঠিয়া কৌপীন পরিতে ছেন—এমন সময় প্রবল বায়ু ভরে সিদ্ধ বাবার কৌপীন খণ্ড তাড়িত হইয়া উড়িতে লাগিল—সাবধানে কৌপীন সংযত করিতেও কিছু সময় কাটিল। গঙ্গাঘাটে বহুকুলবালা স্নান করিতে ছিলেন—তাঁহারা সিদ্ধ বাবার প্রভাবাদি জানিতেন সুতরাং লজ্জায় মুখ ফিরা-ইয়া রহিলেন, এই সময়ে সেই ঘাটে চাড়িচাড়া নিবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জগদীশ মৈত্র উপস্থিত ছিল—সে বৈষ্ণব দ্বেষী ও উগ্রপ্রকৃতি ছিলেন, ব্যাপার দেখিয়া ক্রোধভরে সিদ্ধ বাবাকে বলিলেন—"নদীয়ায় লম্পট বাবাজির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তুমি কুলবধূগণ সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া কি করিতেছ? শীঘ্রই এস্থান হইতে দূর হও নচেৎ প্রহারেন ধনঞ্জয়! হইবে।" বাবাজি মহাশয় লজ্জিত হইয়া বিনয় করিলেও মৈত্র অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিল—'এই লম্পট বেটা, নিজ অপরাধ স্বীকার না করিয়া বায়ুর দোষ দিতেছ।' এই বলিয়া সিদ্ধ বাবাকে এক চপেটাঘাত করিয়া তাঁহাকে সেখান হইতে দূর হইতে বলিল। গঙ্গাঘাটের নরনারী 'হায় হায়' করিয়া উঠিল। বাবা সহাস্য বদনে নির্ব্বিকার চিত্তে প্রহার-কারী ব্রাহ্মণকে কর-যোড়ে বলিলেন—'প্রভ! আমি অপরাধের অনুরূপ শাস্তি পাইয়া পরম শিক্ষালাভ করিলাম, আপনি আমার গুরু। এরূপ কার্য্য আর কখনও করিবনা। এই ঘটনার তিন দিন পরেই জগদীশের জ্বর বিকার উপস্থিত হইল—আর কেবল বাবাজি মহাশয়! ক্ষমা

করুন, আমি অপরাধী—এইরূপ প্রলাপ বকিতে লাগিল। মৈত্র দেখিতেছে যে তাহার শিয়রে সেই সিদ্ধ বাবা দাঁড়াইয়া তখনও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন—মৈত্র পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন তাঁহার আত্মীয়গণ সিদ্ধ বাবার নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বাবাজি মহাশয় শ্রীগৌরের চরণ তুলসী দিয়া বলিলেন 'এই পরমৌষধি সেবন করাইলে রোগী আরোগ্যলাভ করিবে।' ব্রাহ্মণ সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া সেই অবধি বৈষ্ণব দ্বেষ ত্যাগ করিল ও শ্রীগৌর চরণে আত্ম-সমর্পন করিল।" (সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহারাজ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন।)

শ্রীগৌরাঙ্গনাগরের প্রতি এক্ষণে তাঁহার নবানুরাগ। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় যাহা কিছু,—তাহা তাঁহার বড়ই প্রিয়। নদীয়াবাসী নরনারী, বালক বালিকা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার এক একটি নিজ-জন, কেন না তাঁহারা নিত্যধাম নবদ্বীপবাসের সৌভাগ্য পাইয়াছেন। তিনি সকলকেই অতি সম্ভ্রমের সহিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত "বাবাজি! তুমি এমন কর কেন? যাকে দেখ তাকেই প্রণাম কর, কুকুর বেড়াল কিছুই বাদ দাও না, ইহা কেমন কথা? চৈতন্যদাস বাবাজি বিনতবদনে করজোড়ে চৈতন্যভাগবত হইতে নিম্নলিখিত পয়ার শ্লোকগুলি পাঠ করিতেন—

"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি রতি॥

ভাগবতভূষণ ও চৈতন্যদাস বাবাজি—শ্রীধাম নবদ্বীপে চৈতন্যদাস বাবাজি নিজ ভজনানন্দে আছেন। তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার গঙ্গাস্নান করিতেন। একদিন প্রাতে গঙ্গাস্নানে

গিয়া তীরে বসিয়া কি ভাবিলেন,—পরে উচ্চতীর হইতে "জয় গৌরাঙ্গ" বলিয়া গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান করিলেন, পুনর্ব্বার ঐরূপ করিলেন, এইরূপ পুনঃ পুণঃ করিতেছেন, এমন সময়ে সঙ্কীর্ত্তনের দলবলসহ একখানি নৌকা করিয়া ভাগবতভূষণ নবদ্বীপের সেই ঘাটে আসিয়া অবতরণ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি এই অপূর্ব্ব প্রেমের মুরতি খর্ব্বাকায় কৃষ্ণবর্ণ তেজস্বী বৈষ্ণব যুবকের উপর পতিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে এই নবীন বাবাজির নিকট গিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিলেন এবং উভয়ে পরম প্রেমভরে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। এই হইল এই দুই পরম প্রেমিক গৌরভক্তের প্রথম শুভসম্মিলন এবং পরিচয়। সে আজ বহুদিনের কথা, কিন্তু সে অপূর্ব্ব মিলনের মধুময় দৃশ্য যাঁহারা দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নয়নে সে অপূর্ব্ব প্রেমচিত্র যেন এখনও অঙ্কিত রহিয়াছে। ভাগবতভূষণ সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার সঙ্গীদিগকে কহিলেন "এই নবীন বাবাজিকে দর্শন করিয়া আমার গৌরাঙ্গ দর্শনের ফল হইল,—তাঁহার পবিত্র অঙ্গস্পর্শে আমি পবিত্র হইলাম।"

এক্ষণে এই পরম গৌরভক্ত ভাগবতভূষণের কিছু পরিচয় দিয়া আত্মশোধন করিব। ভাগবতভূষণের নাম ছিল রামতনু মুখোপাধ্যায়, তিনি ভাগবতে পরম পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল ভাগবতভূষণ। তিনি এই নামেই পরিচিত ছিলেন। নদীয়া জেলার কোন নগণ্য গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ইহাঁরা চারি ভ্রাতা, তন্মধ্যে রামতনু মধ্যম। বড় ভাই বেদান্ত শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত ছিলেন,—বেদান্তবাগীশ তাঁহার উপাধি ছিল। আর দুই ভাই তেমন পণ্ডিত ছিলেন না, ইহাদিগের সাংসারিক অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। ভাগবতভূষণের বড়ভ্রাতা বেদান্তবাগীশ বহু শাস্ত্র পড়িয়াও মনে শান্তি না পাইয়া গৃহ ত্যাগ করেন, এবং বহু তীর্থ ভ্রমন করিয়া কোন সিদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজীর সঙ্গগুণে—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু-প্রবর্ত্তিত

বৈষ্ণবধর্ম্মে তিনি দীক্ষিত হন। কিছু কাল পরে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া নিজ ভ্রাতা রামতনুকে বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিতে উপদেশ দেন। এই মহাপুরুষের কৃপাবলে রামতনু শ্রীমদ্ভাগবত এবং গোস্বামীশাস্ত্রাদি পাঠ করিলেন,—ভাগবতে পরম পণ্ডিত হইলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া পরমানন্দে গৌরাঙ্গ-ভজন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটেই তিনি গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ভাগবতভূষণের শ্বশুরালয় ছিল, রাণাঘাটের সন্নিকট উলাগ্রামে। সেখানে তিনি বাস করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। সেখানকার অধিকাংশ লোকই শাক্ত, গৌরবিদ্বেষী, সুতরাং তাঁহাকে ও তাঁহার ক্ষুদ্র সংকীর্ত্তনের দলকে বহুভাবে গ্রামবাসী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে হইল। এই জন্য তিনি উলার বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার ভগ্নীপতির বাড়ী জিরাট বলাগড়ে আসিয়া বাস করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি কয়েকজন প্রকৃত গৌরভক্তের সঙ্গ পাইলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া একটি দল বাঁধিলেন। এই দলে তাঁহার কতকগুলি অনুগত অন্তরঙ্গ ভক্ত জুটিল। একদিন তাঁহাদিগকে ভাগবতভূষণ নিজ মনের মর্ম্মকথা বলিলেন। তাহা এই,—"নদীয়ার ব্রাহ্মণকুমার শচীনন্দন আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছেন। আমি জগত গৌরময় দেখিতেছি,—ভাগবতের কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমি গৌরলীলা ব্যাখ্যা করিয়া বসি,—গৌরকথা ভিন্ন অন্য কথা আমার ভাল লাগে না,—মুখে আসে না।" এই বলিয়া পরমতেজস্বী পরমপণ্ডিত পরমসুন্দর যুবাপুরুষ ভাগবতভূষণ স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন! ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার কারণ কি?" ভাগবতভূষণ প্রেমাশ্রুলোচনে গদগদভাবে উত্তর দিলেন "বন্ধুগণ! আমি গৌরগদাধর প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বের নাম জপ করি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি গৌরমন্ত্র আমি দেশ বিদেশে বিতরণ করিব,—কারণ আমি গুরুর নিকট

শুনিয়াছি এই কলিযুগে গৌরমন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্রে ফল হইবে না। আমি গৌরমন্ত্র এবং পঞ্চতত্ত্বের নাম জপ করিয়া যে পরমানন্দ লাভ করিয়াছি, তাহার ভাগী সকলকে করিব,—এই আমার দৃঢ় সংকল্প। আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি এই ব্রত পালন করিব"। ভাগবতভূষণের সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল, যে প্রভুপাদ কোন গোস্বামীসন্তানও তাহা করিতে পারেন নাই।

ভাগবতভূষণ তাঁহার এই সংকল্প সিদ্ধির জন্য নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। সে সকল কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। এই পরম গৌরভক্ত ভাগবতভূষণের সঙ্গে সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজির প্রথম মিলন হয়,—নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে। তাহার পর উভয়ে মিলিয়া একত্রে কয়েক দিন যাবৎ শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন, ইষ্ট গোষ্ঠী, প্রেমরসালাপ, গৌরকীর্ত্তন প্রভৃতি ভজনাঙ্গের যাজন করেন। এই উপলক্ষ্যে উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রণয় হয় এবং উভয়ে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। ভাগবতভূষণ প্রভু সন্তান ছিলেন না,—অধিকারী মোহন্তও ছিলেন না, কিন্তু সর্ব্ব বৈষ্ণবসাধু-গণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তৎকালে তাঁহার মত একনিষ্ঠ গৌরভক্ত আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং চৈতন্যদাস বাবাজির তিনি অতিশয় প্রিয় হইলেন। যে নবদ্বীপ ছাড়িয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে চাহেন নাই,—এখন ভাগবতভূষণের অনুরোধে—তিনি সেই নবদ্বীপ ছাড়িয়া—তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভকে ছাড়িয়া,—জিরেট বলাগড়ে গেলেন। ইহার মর্ম্ম ভক্তবৃন্দ বুঝুন। এ সম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণীই সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির এই কার্য্য সমর্থন করেন যথা, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে প্রভুবাক্য পুরী গোসাঞির প্রতি,—

তীর্থদ্বয়ং যদ্যপি তুল্যমিদং মহান্তঃ কাশ্যাদয়েঽপি পুরতঃ কলুষাপহারী
অনিন্দদাঃ কিল তথাপি মহান্ত এব যদ্‌যুষ্মদীক্ষণ সুখং হি সুখায় তেন (১)

জিয়ড়নৃসিংহ ও চৈতন্যদাস বাবাজি—জিরেট বলাগড়ে গিয়া ভাগবতভূষণ তাঁহার বন্ধু পরম গৌরভক্ত জিয়ড়নৃসিংহের সহিত চৈতন্যদাস বাবাজির মিলন করিয়া দিলেন। এই সময় জিয়ড় নৃসিংহ তাঁহার নিজবাটী বর্দ্ধমান হইতে জিরেট বলাগড়ে আসিয়াছিলেন। এই শুভ মিলনে যে প্রেমের উৎস উঠিল, তাহার স্রোতে জিরেট বলাগড় ও বর্দ্ধমান ভাসিল,—রাঢ়দেশ ডুবু ডুবু হইল। জিয়ড় নৃসিংহ চৈতন্য দাস বাবাজীকে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন; তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিজ বাটী বর্দ্ধমানে লইয়া গেলেন। বর্দ্ধমানে জিয়ড় নৃসিংহের গৃহে বহু গৌরভক্তের সমাগম হইত, গৌরকথা, গৌরকীর্ত্তন, চৈতন্যমঙ্গল গীত প্রভৃতি নিত্য হইত। চৈতন্য দাস বাবাজি এখানে গৌরকথারসার্ণবে ভাসিলেন। ভাগবতভূষণ দেশবিদেশে গৌরধর্ম্ম প্রচার করেন, গৌরমন্ত্র দান করেন, মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধমানে আসিয়া জিয়ড় নৃসিংহ ও চৈতন্যদাস বাবাজীর সহিত মিলিত হন। তিন জনে মিলিয়া যে ইষ্টগোষ্ঠী হয় এবং তাহাতে যে গৌরকথার তরঙ্গ উঠে, এবং গৌরপ্রেমের তুফান বয়, সেই তুফানে পড়িয়া তিন জনে হাবুডুবু খান,—কাহারও জ্ঞানচৈতন্য থাকে না।

---

(১) অর্থাৎ যদি চ শ্রীক্ষেত্র ও শ্রীবৃন্দাবন এই দুইটিই তুল্যতীর্থ এবং অগ্রে কাশী প্রভৃতি মহৎ মহৎ তীর্থ সকল আছেন, এবং তাহারা সকলেই মনুষ্যদিগের পাপসংহারী, তথাপি সাধুবৃন্দই অতিশয় আনন্দপ্রদ, যেহেতু আপনাদিগের দর্শনেই আমার চিত্ত আনন্দরসে বিমগ্ন হইতেছে। অতএব আপনাদিগের মত ভক্তসঙ্গ তীর্থবাস হইতেও অতীব রমণীয়,—ইহা স্থির করিয়াই আমি শীঘ্র চলিয়া আসিয়াছি।

এখানে জিয়ড় নৃসিংহের কিছু পরিচয় দিয়া আত্মশোধন করিব। জিয়ড় নৃসিংহের সম্পূর্ণ নাম জিয়ড় নৃসিংহ বরাট। বর্দ্ধমান জেলায় এই মহাপুরুষের নিবাস,—জাতিতে বৈদ্য। বর্দ্ধমান জজ আদালতে ইনি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, বিষয় সম্পত্তিও ইহার বেশ ছিল। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর রসিকভক্ত ছিলেন, সেই জন্য চৈতন্যদাস বাবাজির সহিত তাঁহার এত আত্যান্তিক প্রণয়। কথিত আছে চৈতন্য দাস বাবাজির কান্তাভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনের শিক্ষাগুরু এই মহাপুরুষ,—জিয়ড়নৃসিংহ বরাট। উভয়ে মিলিয়া যখন নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর ভজনের কথা হইত, তখন কেহ সেখানে যাইতে পারিত না। অবশ্য ভাগবতভূষণ উপস্থিত থাকিলে তিনি থাকিতেন। কারণ, ভাগবতভূষণের ভজনতত্ত্ব জিয়ড় নৃসিংহ ও চৈতন্যদাস বাবাজির অবিদিত ছিল না। ভাগবতভূষণও শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে মধুরভাবে ভজন করিতেন, তবে তিনি একথা প্রকাশ্যে কাহাকেও বলেন নাই। তাঁহার জীবনের শেষ দিনে এ কথা প্রকাশ হইয়াছিল। ভাগ্যে থাকেত সে নিগূঢ় কথা অন্য প্রবন্ধে বলিব।

চৈতন্যদাস বাবাজির নবদ্বীপে পুনরাগমন।—এই ভাবে দুই জনে বর্দ্ধমানে বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে কান্তাভাবে ভজন করিতে করিতে, জিয়ড় নৃসিংহের ইচ্ছা হইল, একবার শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়া, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভকে দর্শন করিয়া আসি। চৈতন্য দাস বাবাজিকে তাঁহার মনের কথা বলিলেন। তখন দুই জনে একত্রে শ্রীধামে আসিলেন। ইহার পর চৈতন্যদাস বাবাজি আর বর্দ্ধমানে যান নাই। জিয়ড় নৃসিংহ বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে বলিলেন "চৈতন্যদাস! তুমি এখানে থাকিয়া প্রভুকে ভজনা কর, তোমার ভজনফলেই আমি উদ্ধার হইব।" ভজননিষ্ঠ শিষ্যের ভজনফলে যে গুরু উদ্ধার হন, ইহা শাস্ত্র ও মহাজন বাক্য।

তবে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস তন্ত্র সকলেই এক বাক্যে আমার গৌড়েশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের উপাসনা গায়ত্রী (গানের) দ্বারায় করিতেছেন। অতএব "কীর্ত্তনই" সর্ব্ব প্রধান উপাসনা।

নদীয়া-যুগল প্রেম-সেবা

গৌরাঙ্গ সুন্দর, নব নটবর, নব নবদ্বীপ-ইন্দু।
নাগরীবল্লভ, ভুবন দুর্ল্লভ, পূর্ণ করুণাসিন্ধু॥
লাবণ্য-বারিধি, সর্ব্ব গুণনিধি, অঙ্গ ভূষিত মালে।
চন্দন চর্চ্চিত, দেহ সুবলিত, অলকা তিলকা ভালে॥
দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, মাখান অমিয়া, সুন্দরীকুল রাণী।
গৌর বামে বসি, প্রেমানন্দে ভাসি, হাসি কহে রসবাণী॥
যুগল মিলনে, প্রেম আলাপনে, নদীয়া যুগল ভোর।
প্রেম-রসে মাতি, রহে দিবা রাতি, আনন্দ নাহি ওর॥
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রেম বিনোদিয়া, ভুবনমঙ্গল রূপ।
নদীয়া নাগরী, রসের গাগরী, রসময় রসকূপ॥
নদীয়া যুগলে, যে ভজে বিরলে, নাহি তার দুখ লেশ।
ভজন আনন্দ, পাইয়া যোগেন্দ্র, ভ্রমিতেছে দেশ দেশ॥
যোগেন্দ্র মোহন দাস।

প্যারি ও সখি মাতা। চৈতন্য দাস বাবাজি এই যে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন, ইহার পর তিনি শ্রীখণ্ডে গিয়াছিলেন, আর কোথাও তিনি নবদ্বীপ ছাড়িয়া যান নাই। শ্রীখণ্ডের কথা পরে বলিব।

প্রায় দশ বৎসর হইল তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পিতৃব্য গৌরনাথ রায় এখনও জীবিত,—তাঁহার পিতৃব্য পত্নীও জীবিতা আছেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহারা নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহাদের জীবন

সর্ব্বস্বধন চৈতন্যদাসকে দেখিয়া যান,—শুধু দেখিয়াই তাঁহাদের সুখ। এক্ষণে তাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহাদের প্রিয়তম জগবন্ধু এ সংসারের জীব নহেন,—এ পৃথিবীর লোক নহেন, যেন কোন শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কুল পবিত্র করিয়াছেন। মনকে এই বলিয়া তাঁহারা প্রবোধ দেন, কিন্তু চৈতন্য দাসের সেবা শুশ্রূষার জন্য কোন আপনার লোক তাঁহার নিকটে থাকে, প্রাণে তাঁহাদের এরূপ একটা প্রবল ইচ্ছা হয়। দয়াময় শ্রীগৌর ভগবান তাঁহাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। চৈতন্যদাস বাবাজির বৈমাতৃক একটি বালবিধবা ভগ্নী ছিলেন। তিনি পরমা ভক্তিমতী ছিলেন,—শ্রীগৌরাঙ্গচরণে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তাঁহার নাম ছিল প্যারি। এই ভক্তিমতী স্ত্রীলোকটির একটি ভক্তিমতী বিধবা ননদিনী ছিলেন,—তাঁহার নাম ছিল সখী মাতা। বাবাজী মহাশয়ের পিতৃব্য গৌরনাথ দেশে ফিরিয়া গিয়া এই তুইটি ভক্তিমতী স্ত্রীলোককে নবদ্বীপবাসের পরামর্শ দিলেন এবং তাঁহাদিগের নবদ্বীপবাসের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তুইটি স্ত্রীলোকই সমবয়স্কা,—অনধিক চল্লিশ বৎসর তখন তাঁহাদিগের বয়স। চৈতন্যদাস বাবাজির সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য এবং তাঁহাদিগের ভজন সাধন শিক্ষা ও তীর্থবাসের উদ্দেশ্যে, এই তুইটি পরমা ভক্তিমতী স্ত্রীলোক এই সময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস করিতে আসিলেন। তাঁহারা পৃথকভাবে ভজন কুটির করিয়া থাকিতেন, মাধুকরী করিয়া জীবন যাপন করিতেন, মধ্যে মধ্যে চৈতন্যদাস বাবাজির নিকট আসিয়া তাঁহার সেবা পরিচর্য্যাদি করিতেন। কথিত আছে এই তুইটি স্ত্রীলোক চৈতন্যদাস বাবাজির নিকট গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং তিনি তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের মধুর ভজন শিক্ষা দেন। এই তুইটি স্ত্রীলোকের ভজনপ্রণালী ছিল অপূর্ব্ব,—প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া ইহাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে বসিয়া লক্ষ হরি-

—২

নাম জপ করিতেন, তাহার পর বাবাজি মহাশয়ের নিকট গিয়া ভজন শিক্ষা করিতেন, তাঁহার সেবা পরিচর্য্যাদি করিতেন। ভিক্ষালব্ধ মাধুকরীর অংশ তাঁহারা বাবাজি মহাশয়কে দিতেন। এইভাবে তাঁহারা দুইজনে শ্রীনবদ্বীপে বসিয়া গুরুসেবা করিয়া গৌরাঙ্গভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন, মধুর ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গভজনের সৌভাগ্য কোটির মধ্যে এক জনের ভাগ্যে উদয় হয় কি না সন্দেহ। চৈতন্যদাস বাবাজি নিজ ভজন-তত্ত্ব এই দুই উচ্চাধিকারিণী শিষ্যাকে কিছু কিছু শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রশিষ্য নবদ্বীপ-রস রসিক কৃষ্ণ-দাস বাবাজি। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির অন্তর্দ্ধানের পর এই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির সংলগ্ন তাঁহার সমাধিস্থলে বসিয়া বহুদিন শ্রীগৌরাঙ্গভজন করিয়া কিছুদিন হইল অতি বৃদ্ধ বয়সে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।

নবদ্বীপরস-রসিকা নাগরীভাবে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি।—চৈতন্যদাস বাবাজির এক্ষণে পূর্ণ নদীয়া-নাগরীভাব। তিনি স্ত্রীলোকের মত বেশভূষা করেন, গৌরবর্ণা সুন্দরী নদীয়া-বালিকা দেখিলেই তাঁহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গনাগর বিষয়ক রস-কথা কহেন,—আদর করিয়া বহু সম্মান করেন—আর মনে মনে ভাবেন "আহা! ইহাঁদের কি সৌভাগ্য, ইহাঁরা কত না সৌভাগ্য করিয়া নদীয়া-বালা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—ইহাঁরাই বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ গৌরাঙ্গনাগরকে পতিভাবে পাইবেন। কারণ ইহাঁদের সহজ প্রেমভাব,—আমার প্রতি বিধাতা বিমুখ,—পুরুষদেহ লইয়া নদীয়ার বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে"। এই তাঁহার মনের ভাব,—এইভাবে বিভাবিত হইয়া বাবাজি মহাশয়কে সময়ে সময়ে বিশেষ অনুতপ্ত দেখা যাইত। মধ্যে মধ্যে গুন গুন স্বরে তিনি

গান গাহিতেন—

হরি ! হরি ! হেন দিন কবে বা হবে গো !
নদীয়াবাসীর ঘরে,—অপরূপ রূপ ল'য়ে,
তনয়া হইয়া মুঞি জনমিব কবে গো ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ বংশের প্রভুপাদ গোস্বামীদিগকে দেখিলে তিনি সসম্ভ্রমে ঘোমটা টানিয়া দিতেন,—তাঁহাদিগের সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতেন না। তাঁহার ভাব ছিল,—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার প্রণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গনাগরের অগ্রজ,—তাঁহার বংশাবলীর প্রাচীন গোস্বামীপাদ-গণও তাঁহার পক্ষে ভাসুরের মত মাননীয় ও পূজনীয়।

শ্রীগৌরধাম গত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশাবতংশ প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্নের সহিত মিলন।

একদিন প্রত্যুষে সিদ্ধ বাবাজি মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে নির্গত হইয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমন্দিরের সম্মুখ দিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গনাগরের কান্তাভাবে বিভাবিত বাবাজি মহারাজ তাঁহার ভাসুর নিতাইচাঁদের বাড়ীর সামনে দিয়া যাইবার কালে তাঁহার অপরিসর বহির্বাস দ্বারা কোন রকমে অবগুণ্ঠনে বদন আচ্ছাদিত করিয়া লজ্জাবতী স্ত্রীলোকের ন্যায় যাইতেন। সেই সময় শ্রীশ্রীবাস অঙ্গনের তৎকালীন সেবাইত শ্রীনিত্যানন্দ বংশাবতংশ প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্নের, সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রভুপাদও শ্রীনিত্যানন্দের অনঙ্গমঞ্জরী তত্ত্বের আনুগত্যে শ্রীমন্মহা-প্রভুর একজন কান্তাভাবে ভজনের উপাসক। প্রভুপাদের সহিত বাবাজি মহারাজের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি বাবাজি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন যে,—"আপনি নিতাইচাঁদের শ্রীমন্দিরের সম্মুখ দিয়া আসিবার কালে ঘোমটা দিলেন কেন?" উত্তরে বাবাজি মহাশয় সলজ্জভাবে নিবেদন করিলেন যে "ভাসুরের সামনে দিয়া আসিলাম বলিয়া ঘোমটা দিলাম।" তখন প্রভু, শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের

বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—

"নিতাই সুন্দরের যোগপীঠ ধরে রত্ন সিংহাসন শেষ।
বসন নিতাই ভূষণ নিতাই বিলাসে সখীর মাঝ" ॥

"যদি এই শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব হন, তবে গত রাত্রে আপনি কোন বিছানায় শুইয়াছিলেন? কোন বসন পরিয়া, কোন ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গনাগরকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন? প্রভুর এই কথা শুনিয়া বাবাজি মহাশয়ের আনন্দ আর ধরে না। উভয়েই অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাব ভূষণে বিভূষিত হইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন, উভয়েই প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা কাল অচৈতন্য হইয়া রজে পড়িয়া থাকেন। ইতিমধ্যে বেলা অধিক হইল ঐ জনবহুল পথে বহু লোকের সমাগম হয়। স্থানীয় বৈষ্ণবগণ প্রভুপাদের ও শ্রীবাবাজি মহারাজের এই অলৌকিক প্রেমাবেশ দর্শণে নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। বহুক্ষণ পরে উভয়ের বাহ্যজ্ঞান আসিলে উভয়েই সবিশেষ লজ্জিত হইয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া যান। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্ন প্রভু তৎকালীন প্রভু সন্তানদিগের মধ্যে একজন বিশিষ্ঠ পণ্ডিত এবং একনিষ্ঠ শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দানুরাগী ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ভিন্নও তাঁহার ইংরাজী ফরাসী ইত্যাদি বৈদেশিক কয়েকটি ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার রচিত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আচরণ বিষয়ক ও ভক্তিবাদ, সম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি তর্ক দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তৎকৃত শ্রী"বৈষ্ণব আচার দর্পন" নামক গ্রন্থ শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ পরিকরের লীলা আস্বাদন ধারা জানাইয়া ভজনের দিগদর্শন করাইয়া দেয়। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডে "**শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধুর্য্যময় অষ্টকালীন লীলা**" স্মরণ মননের ভাবধারা বাবাজি মহারাজের ভাবানুকুল বলিয়া এবং তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট বলিয়া এই স্থলে পাঠকগণকে উপহার দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম, সুমাধুর্য্য-পরিণাম,
সর্ব্বরস-গুণের নিধান।
সকল ধাম নিদান, রসসার-উপাদান
সর্ব্বরস-বিকাশের স্থান॥
ভক্তিরসে অধিষ্ঠিত, সুরধুনি-সুবেষ্টিত,
ত্রিপথগা-ভক্তি-বিলুণ্ঠিত।
বেদাদি-গুহ্য-প্রচার, বর্ণিবারে শক্তি কার,
যাহা হয় অনন্তাঽবিদিত॥
শ্রীলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, আদি-নাগরিকা হিয়া,
দিয়া যাহা সুগঠিত মানি।
নবদ্বীপময়ি উক্তি, নদীয়া নাগরী-যুক্তি,
ভাবেতে প্রকাশ কৈল জানি॥
সুমাধুর্য্য সারাৎসার, করুণ্যামৃত-পারাবার,
সর্ব্বাদ্ভুত-সার-উপাদান।
শ্রীগৌরাঙ্গ মনোহর, রসরাজ মূর্ত্তিধর,
রূপ গুণ রসের নিদান॥
মহাভাব নটবর নাগরেন্দ্র বিশ্বম্ভর,
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া-সহরাস।
নদীয়া নাগরী সঙ্গে, বিলাসে অশেষ রঙ্গে,
বিপরীতে প্রত্যঙ্গ—বিন্যাস॥
প্রতি অঙ্গ প্রতি অঙ্গে সবে পরস্পর সঙ্গে,
বিপরীত রসরাস-কেলি।
অসংখ্য পক্ষির তানে, সে রঙ্গ নটেন্দ্র জানে,
বিস্তারিল নবনারী মেলি॥
বিপরীত নৃত্যরাস নানাবিধ সুবিলাস,
নব নাগরীকাগণ সঙ্গে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ কিশোর নটবর সুনাগর,
নিত্য-বিলাসী নানারঙ্গে।
নানা বিহঙ্গের গানে, নিশা অবসান জ্ঞানে,
জাগি-যুগ কিশোরিকা সঙ্গে॥
রসেররঙ্গিনী-অতি, করে মঙ্গল-আরতি,
নৃত্য-গীত বাদ্যের তরঙ্গে॥
অরুণ-উদয় কালে রসালস-সুবিশালে,
রসরাজ স্বতল্প তেজিয়া।
মায়ের আদেশে জাগি, উঠি রস অনুরাগি,
নদীয়া নাগরী-বিনোদিয়া॥
ক্রোড়ে নাই রসবালা দেখিয়া শেষে উঠিলা,
কিছু কিছু প্রাতঃকৃত্য কৈল।
হেথা পুষ্প আহরণে আরামে রমণীগণে,
গিয়া কত কুসুম তুলিল॥
গৌর মুখ প্রক্ষালিয়া রঙ্গিনী বেশ ধরিয়া,
কুসুম কাননে প্রবেশিল।
রসিকা নাগরীগণ, সঙ্গে রঙ্গে সুরমণ
বিপরীতে প্রীতে বিলসিল॥
শেষে প্রাতঃকৃত্য সারি, মজ্জি সুরধুণী-বারি,
বিপরীত জল কেলি রসে।
মগ্না কত কুলবালা, সঙ্গে মহারাস লীলা,
করি নিজ গৃহে আসি বৈশে॥
চর্ব্ব্য চোষ্য ভক্ষ্য লেহ্য, নানাবিধ পেয় ভোজ্য,
মাতৃ-কৃত যত উপহার।
আস্বাদিল নানারঙ্গে, নদীয়া-নাগরী সঙ্গে,
সে বর্ণিতে শক্তি আছে কার॥

নব-নারী সহরাস, রঙ্গ রভসে বিলাস,
রতি কৈল রসের শয্যায়।
বিপরীত রতি-রস আকুল অলসাবশ,
কৈল গৌর সব রসিকায় ॥
প্রত্যেক কুলের বালা, মুখে মুখ ধরি গলা,
রঙ্গিয়া রমিয়া সেই কালে।
অবসান নিদ্রা-রসে দেখে মোহিনীর বেশে,
প্রাণরমা রঙ্গের বিশালে ॥
অসহ্য বিরহে-ভাগে, মধ্যাহ্ন সময় জ্ঞানে,
দোঁহে মিলে গঙ্গাস্নানে গেলা।
শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া, পুষ্প মাল্যাদিক লৈয়া,
শেষে গৌরসুন্দরে মিলিলা ॥
নানামতে জলকেলি প্রত্যেক রঙ্গিনী মেলি,
বিপরীত প্রেমের তরঙ্গে।
মাধুর্য্যামৃত সাগর, রসরাজ-নটবর
নবদ্বীপ নাগরিকা সঙ্গে ॥
লীলা বিলাসে বিহরি, প্রেমানন্দে গৌরহরি,
নিজ গৃহে আসিয়া বিরাজে।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যত, নানাবিধ মাতৃ-কৃত,
ভুঞ্জে রস রঙ্গিনী সমাজে ॥
একত্র হইয়া বৈশে, যুগ গৌরী দুই পাশে
নানামত রমণ বিলাস।
রসালসে অল্পক্ষণ জাগি মোহিনী-মোহন
চাঁদমুখে সুধাময় হাস ॥
নগর ভ্রমণ-ছলে, বিনোদ বিধানে চলে,
চাতুরিণী রঙ্গিনী দেখিল ॥

মাতৃ-বাক্য ছল লই পিতা স্থানে কহি ধাই,
নাগরেন্দ্র স্বগৃহে আনিল।
উপহার সংখ্যাতীত, ভুঙ্গাইল মাতৃকৃত,
রস বালায় কত শ্লেষ কৈল ॥
হেনকালে বৃষ্টিবাৎ, রসপুষ্টি অকস্মাৎ
আপদে সম্পদ সার হৈল ॥
রসকেলি সবাসঙ্গে অনন্ত অনঙ্গ রঙ্গে
বাৎ বৃষ্টি গেল সন্ধ্যাকালে।
তবে গৌর কুতুহলী, প্রদোষে সে রসকেলি,
বিপরীত রঙ্গিনী রসালে ॥
বিহরিয়া গঙ্গাতীরে, আসি নিজ মন্দিরে,
আরাত্রিক রঙ্গিনীর রঙ্গ।
হৈল গঙ্গাতটে আসি, নিরখিয়া শোভা শশী
উথলিল মনে কত রঙ্গ ॥
প্রেম সিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ, নামামৃত সর্ব্বস্বাঙ্গ,
মাধুর্য্যামৃত-মনণ মথনে।
প্রেমরস নাটগুরু বাঞ্ছা সিদ্ধি কল্পতরু
নবদ্বীপ নিমগ্না-মিলনে ॥
ইচ্ছায় হইল ধ্বনি, অত্যদ্ভুত সম্মোহিনী
রামাগণে বিপিন ভরিল।
শ্রীশ্রীলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া পুষ্প মাল্যাদিক লইয়া
শেষে গৌরসুন্দরে মিলিল।
অশেষ-রভস-বালা, রূপ রস রঙ্গ মালা,
মিলি মহা মহা-রাস কৈল।
বিলাস-পোষাক-মতে, নাট্য বাদ্য রঙ্গ গীতে,
পরস্পর চমৎকৃত হৈল ॥

বিপরীত-রীতে রস রঙ্গ নাট্যাবেশ বশ,
অবশ হৈয়া কুলরমা।
নানাবিধ বিহঙ্গম, গান তান সমাগম,
সম, সুখ রমি পূর্ণ-কামা॥
সহ লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, গোরা নিজ গৃহে গিয়া
ভোজন শয়ন রতিরস।
কৈল যত নানা মতে অসমর্থ কল্পশতে
বর্ণিতে যাহার অল্প লেশ॥
প্রত্যেক রঙ্গিনী ক্রোড়ে, করি গোরা নটবরে,
তা সবারে গৃহেতে মিলিল।
প্রতি গৃহে রমণেন্দু বিস্তারিল রসসিন্ধু,
লীলাহচিত্ত শক্তি দেখাইল॥
নিত্য লীলা পরাৎপর মাধুর্য্যামৃত-রসেশ্বর,
অনাদি অনন্তলীলা সিন্ধু।
নিজ গুণে গোরা রায় ভক্তে চাকাইতে তায়
লেখায় মাত্র অতি ক্ষুদ্র বিন্দু॥
অসমোর্দ্ধ শ্রীচৈতন্য তাঁর দাস হৈতে ধন্য
এ লীলা প্রকট হৈল যাহে।
গৌর রসর্ণব সুধা নিত্য পাণে বাঢ়ে ক্ষুধা
মত্ত গৌর সিংহদাস তাহে
নবদ্বীপ ধামে বাস সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস
খ্যাত নদে নাগরীর ভাবে।
করুণা করিয়ে মোরে আদেশিল বর্ণিবারে
এই লীলা রঙ্গের বিভাবে॥
অসৎসঙ্গে মন্দ মতি এ ভবে কারাতে স্থিতি
হয়েছিল অশেষ বন্ধনে

নিজগুণে বলাৎকারে উদ্ধারিয়ে লইল মোরে
গতিহীনে অনেক যতনে ॥
শ্রীভাগবত পারাণ, সাপ্তাহিক-অধ্যয়ণ
শুনি মহাপ্রভুর মন্দিরে।
নিজ নাথের সম্মুখে ভাসাইল প্রেমসুখে
মো অধম পতিত পামরে ॥
স্ফুরিবে তোমাতে সব গৌর লীলা অনুভব,
সর্ব্বদাই যখন ধেয়াবে।
এই সে প্রসাদ বরে বর্ণিবার শক্তি ধরে
লেখায় মোরে তাহারি প্রভাবে ॥
আমি অপরাধি অতি সদা পাপাচারে মতি,
যাহা কিছু নিতাই কৃপায়।
গুরু জাহ্নবার দয়া দিয়া মোরে পদছায়া,
মূল কার্য্য যে কিছু করায় ॥
নিতাই পতিত পাবন বলাৎকারে বিতরণ
করে প্রেম আপনা করিয়া।
মোর সব কালে তাই দোহাই জাহ্নবা নিতাই
যার বলে গৌরগণের দয়া ॥
হৈল দিল পদ ছায়া জুড়াইল সব কায়া
তাতে লিখি তাহারি লেখায়।
নবদ্বীপচন্দ্র দাস সে মাধুর্য্যে সদা আশ
দৃঢ় থাকে এই বাসনায় ॥

(শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধুর্য্যময়লীলা অষ্টকালীন স্মরণ মঙ্গল সমাপ্ত)

শ্রীনিত্যানন্দবংশীয় অল্পবয়স্ক বালক দেখিলে তাহাদিগকে বাবাজি মহাশয় "ভাসুর পো" বলিয়া সম্বোধন করিয়া আদর করিয়া হাতে ধরিয়া মিষ্টান্ন প্রসাদ দিতেন। তাহাদিগকে লইয়া বালকের মত খেলা করিতেন।

চৈতন্যদাস বাবাজি নিত্য নূতন নদীয়া-নাগরীবেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রেমাবেশে অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাঁহার সহিত কত রস-কথা বলিতেন,—মৃদুমধুর স্বরে প্রাণবল্লভ বলিয়া প্রেমভরে ডাকিয়া অপার প্রেমানন্দ অনুভব করিতেন। প্রাতে উঠিয়া মঙ্গলারতি দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বসিয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রণবল্লভের শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন,—তাঁহার দুই নয়ন দিয়া প্রেমনদী বহিত,—হাতের মালা হাতেই রহিয়া যাইত,—জপ আর হইত না। ইহার কিছুক্ষণ পরে তিনি শ্রীমন্দিরের দ্বারে গিয়া অতিশয় প্রেমভরে মৃদু মধুরভাষে ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার প্রাণবল্লভকে জিজ্ঞাসা করিতেন "ওগো! আজ কি দিয়ে ভোজন করিবে বল দেখি? তুমি শাক বড় ভালবাস, কিসের শাক আজ পাক করিব? গর্ভ-মোচার ঘণ্ট কি আজ করিব?" এইরূপ প্রেমরসপূর্ণ ভোজনবিলাস বিষয়ক প্রশ্ন করিয়া, একদৃষ্টে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি উত্তরের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিতেন, পরে পাকগৃহের দ্বারে গিয়া সেবাইত মা গোস্বামিনীকে মৃদুমধুর বচনে কহিতেন, "মা গোসাঞি! আজ প্রভু আমার কচুর শাক ও গর্ভ-মোচার ঘণ্ট খাইতে চাহিয়াছেন। যেন এই দুইটি ব্যঞ্জন আজ পাক হয়"। মা গোস্বামিনীগণ সকলেই চৈতন্যদাস বাবাজিকে বিশেষরূপে জানিতেন ও চিনিতেন,—সকলেই তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। জীবাধম লেখকের জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগিনী শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন সেবাইত ছিলেন। তিনি এক্ষণে গৌরধামগতা। তিনি চৈতন্যদাস বাবাজিকে সবিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন,

উপরোক্ত কথাগুলি আমি তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি।

সিদ্ধ চৈতন্য বাবাজি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আরতি দর্শন করিয়া ঠাকুর নরহরি কৃত শ্রীগৌরাঙ্গষ্টক পাঠ করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিতেন। তাঁহার মুখে এই স্তবটি বড় সুন্দর লাগিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় পরম পণ্ডিত ছিলেন, সুকণ্ঠ ছিলেন, সুরের সঙ্গে এই অপূর্ব্ব অষ্টকটি পাঠ করিতেন। ইহার প্রথম স্তবকটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

গোপীনাং কুচ-কুঙ্কুমেন নিচিতং বাসঃ কিমশ্চারুণং
নিন্দৎ কাঞ্চনকান্তি রাস-রসিকাশ্লেষেণ গৌরং বপুঃ।
তাসাং গাঢ়করাভিবন্ধনবশান্ লোমোদ্গম দৃশ্যতে
আশ্চর্য্য সখি পশ্য লম্পটা-গুরো সন্ন্যাসীবেশং ক্ষিতৌ॥

স্তব পাঠ শেষ করিয়া তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া গুন গুন স্বরে মধুকণ্ঠে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এই গানটি গাহিতেন।

বঁধু কি আর বলিব আমি!
জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হোয়ো তুমি।
বঁধু, তোমার চরণে আমার পরাণে, লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
মন প্রাণ দিয়া সব সমর্পিয়া, নিশ্চয় হইনু দাসী॥

নদীয়াবাসী এবং বিদেশী বহু ভক্তবৃন্দ তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব গান শুনিতেন এবং তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবভঙ্গী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী ও চৈতন্যদাস বাবাজি।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ বৈরাগী-বিদ্বেষী। কিন্তু সিদ্ধ চৈতন্য-দাস বাবাজির প্রতি তৎকালীন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপক-বৃন্দের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা শুনিয়া মনে বড় আনন্দ হয়। নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিতপ্রবর নিত্যধামগত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির সঙ্গ করিতেন, এবং এরূপ শুনা যায়

তাঁহার সৎসঙ্গফলেই বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হৃদয়ে গৌরভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়,—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর ভগবত্তায় তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তিনি মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে আসিয়া চৈতন্যদাস বাবাজির সঙ্গ করিতেন,—তাঁহার নিকট বসিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতেন,—উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ সম্প্রীতির ভাব লক্ষিত হইত। ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অন্যান্য বৈষ্ণবদ্বেষী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এজন্য ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে নিন্দা ও উপহাস করিতেন,—কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি একদিন বলিয়াছিলেন "এই পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর চিহ্নিতদাস,—প্রভু ইহাঁর দ্বারা হরিভক্তি প্রচার করিবেন, —ইহাঁর পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে হরিভক্ত হইবেন"। শ্রীধাম নবদ্বীপের হরিসভা এবং পূজ্যপাদ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধরগণের বৈষ্ণবাচার এবং বংশানুক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গভজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বাবাজি মহাশয়ের বাক্যের সম্পূর্ণ সফলতা প্রমাণ করিতেছে।

পূর্ব্বস্থলী নিবাসী পণ্ডিত রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুকৃতি বলে চৈতন্যদাস বাবাজির সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং শ্রীগৌরাঙ্গচরণে সুদৃঢ় ভক্তি ছিল। তিনি পূর্ব্বস্থলী হইতে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে আসিয়া সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির সহিত গৌর-কথা কহিতেন। এই সূত্রে দুই জনের মধ্যে প্রীতির বন্ধন সৃষ্ট হইল,— উভয়ে বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইলেন। পণ্ডিত রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের দুই পুত্র,—মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্র। তিনি যখন বাবাজি মহাশয়ের নিকট আসিতেন, বালক পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া আসিতেন। রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের দরিদ্রতা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছিল,—কিন্তু সে কথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। অন্তর্য্যামী চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয় সকলি জানিতেন। তিনি একদিন কথায় কথায়

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! তোমার এই দুইটি পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও যশস্বী হইবে,—ইহাদিগের দ্বারা তোমার সকল দারিদ্র্য দুঃখ দূর হইবে। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর চিহ্নিত দাস"। সিদ্ধ সাধু বৈষ্ণবের কথা কখন অসত্য হইতে পারে না। নবদ্বীপের এই মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, পাশ করিয়া প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। আইনজ্ঞ যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ডি, এল ছিলেন,—বহু আইন গ্রন্থ লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বাবাজি মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে তাঁহারা দরিদ্র পিতার দারিদ্রদুঃখ দূর করিয়াছিলেন। অনেক দিন পরে একদিন পণ্ডিত রুদ্রকণ্ঠ বাবাজি মহাশয়ের নিকট আসিয়া পুত্রদ্বয়ের কৃতীত্ব ও পদোন্নতির কথা বলিতেছিলেন,—সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি ইহাতে প্রীত হইয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! তোমার দুঃখ প্রভু দূর করিয়াছেন,—এখন এক কাজ কর, মহেন্দ্রকে বল, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর জন্মোৎসব সে যেন ভাল করিয়া করে"। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহে গিয়া মহেন্দ্রবাবুকে একথা বলিলেন, মহানন্দে মহেন্দ্রবাবু বাবাজি মহাশয়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। তিনি তাৎকালিন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর প্রধান সেবাইত গৌরধামগত দীননাথ গোস্বামী প্রভুর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতি বর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব বহুব্যায়ে সম্পন্ন করিতেন। তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে বাড়ী করিয়া তথায় মহাসমারোহে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত "শ্রীগৌরচন্দ্র চরিতামৃত" কাব্য তাঁহার একনিষ্ঠ গৌরভক্তির নিদর্শন।

স্বর্গগত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ও সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির সঙ্গ করিতেন; তাঁহার গৌরভক্তির পরিচয় তাঁহার রচিত শ্লোকাবলীতে পাওয়া যায়, এই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন, যদি কেহ মনে প্রকৃত শান্তি চান, বৈষ্ণব-

দিগের প্রেমধর্ম্ম বুঝিতে চান, তিনি যেন সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির সঙ্গ করেন"। এখন বুঝুন, নদীয়ার পণ্ডিতগণ এই কৌপীনধারী সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়কে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার নদীয়া নাগরীভাব দেখিয়া কেহ কখন তাঁহার প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ করিয়া অপরাধ অর্জ্জন করেন নাই।

শ্রীখণ্ডে সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজি। চৈতন্যদাস বাবাজি শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে দুই তিনবার শ্রীখণ্ডে গিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডের পূজ্যপাদ ঠাকুর নরহরির গোষ্ঠীর সহিত বাবাজি মহাশয়ের বড়ই সম্প্রীতি ছিল। "নরহরির প্রাণগৌর" ও "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌর" লইয়া কত যে রঙ্গ হইত, তাহা প্রত্যক্ষদর্শিদিগের মুখে শুনিতে বড়ই আনন্দ হয়। সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়ের "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌর" "ঠাকুর নরহরির প্রাণগৌরের" নিকট লীলা-কথা-রঙ্গে,—কখন বা হার মানিতেন,—কখন বা জিতিতেন। যখন হার মানিতেন তখন বাবাজি মহাশয় নরহরি ঠাকুরের গোষ্ঠীর উপর প্রীতির সুধামধুর গালি বর্ষণ করিতেন,—আর যখন জিতিতেন, উচ্চ হাসি হাসিয়া কটিতটে হাত দিয়া প্রেমানন্দে মধুর নৃত্য করিতেন। শ্রীখণ্ডে অবস্থানকালে সেখানে দুইটি দল হইত, এক দলের লোক ঠাকুর "নরহরির প্রাণগৌরকে" লইয়া মহা ঔৎসক্যের সহিত প্রেমানন্দে রসরঙ্গে সিদ্ধ বাবাজির সহিত কৌতুকরঙ্গ করিতেন, আর একদল বাবাজি মহাশয়ের সহিত মিলিয়া "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর"কে লইয়া সেই সকল কৌতুক রঙ্গ রসকথার উত্তর দিতেন। এইভাবে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া শুক-সারীর পালা গীত হইত। ইহাতে উভয় পক্ষের আনন্দের অবধি থাকিত না।

সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বাড়ীতে আশ্রয় লইতেন, আর কোথাও যাইতেন না। শ্রীখণ্ডবাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। ঠাকুর নর-

হরির গোষ্ঠীবর্গকে তিনি গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন। গৌরধামগত পূজ্যপাদ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মহাশয়কে তিনি গুরু বুদ্ধিতে সর্ব্বদা নতি স্তুতি করিতেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে যখন চৈতন্যদাস বাবাজি শেষবার শ্রীখণ্ডে যান, তখনকার একটি কাহিনী ভক্তবর রাধারমণ সরকারের মুখে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম।

অতি বৃদ্ধ সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় শ্রীখণ্ডের শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেছেন,—তিনি তখন জরাভারগ্রস্থ, এমন সময়ে হঠাৎ তিনি বলপূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। যিনি ধরিয়া ছিলেন তিনি দেখিলেন হঠাৎ বৃদ্ধ জরাতুর বাবাজি মহাশয় যেন মহা বলবান হইলেন। শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ হইলে সেবাইত ঠাকুর বংশীয়েরা বহির্দ্বারে একত্রিত হইলেন, তাহার মধ্যে পূজ্যপাদ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মহাশয়ও ছিলেন। প্রায় দুই তিন দণ্ডকাল বাবাজি মহাশয় শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে কি করিলেন, তাহা কেহ জানিতে পারিলেন না, কিন্তু যখন তিনি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহির হইলেন, তখন তাঁহার পরম জ্যোতির্ম্ময় শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া,—সহাস্য বদনের প্রেমপূরিত মধুর চাহনি দেখিয়া, সকলেই বুঝিলেন তিনি প্রেমরসরঙ্গে ও প্রেমভজনানন্দে যেন টলমল। তাঁহার অপূর্ব্ব নদীয়ানাগরী ভাব, বেশও তদ্রুপ। মুখে মধুর হাসি, নয়নের কোনে যেন বিজলি খেলিতেছে। শ্রীমন্দিরের দ্বারেই গৌরধামগত সর্ব্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই দাঁড়াইয়াছিলেন। সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় দ্বার খুলিলেই তিনি তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বাবাজি মহাশয় এখনও গৌর-গরবিণী ভাবে বিভাবিত, —তিনি পূজ্যপাদ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের মস্তকে শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সে হাসির মর্ম্ম কেহ বুঝিল না। সর্ব্বানন্দ ঠাকুরেক তিনি গুরুবুদ্ধিতে চিরদিন প্রণাম করিয়া আসিতেছেন। আজ হঠাৎ একি ভাব ? এই ভাবিয়া সকলেই আশ্চর্য্য মনে করিলেন।

কিন্তু সেদিন এই অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া সকলেই সিদ্ধবাবাজি মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণ ধুলি লইয়া কৃতার্থ হইলেন। সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের আজ বড় আনন্দ,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল, তিনি প্রেমানন্দে অধীর হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। নদীয়ানাগরী ভাবের ভজন প্রণালী বড়ই মধুময়,—কিন্তু এ'ভজনের অধিকারী অতি বিরল।

আজও শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে সিদ্ধ বাবাজি মহারাজের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার শ্রীহস্ত লিখিত একখানি গ্রন্থ শ্রীখণ্ডবাসী পণ্ডিত প্রবর রাখালন্দ শাস্ত্রী মহোদয়ের গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, নিম্নে ১ হইতে ৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত লিখিত বিষয়গুলি উক্ত শ্রীগ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে ঐ গুলি একবার শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী' নাম পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। শ্রীখণ্ডবাসী পূজ্যপাদ শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় এই প্রবন্ধে ঐগুলি সংযোজিত হইল। পাঠকগণকে উপহার দিতে পারায় পরমানন্দ লাভ করিলাম।

১। শ্রীশ্রীসিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয়ের স্বহস্তে লিখিত "তুলাট কাগজে লক্ষাধিক গোরা নামাক্ষরের ব্লক ঃ—

তুলাট করা কাগজের পাতায় নামগুলি ঠিক মুক্তার মালার ন্যায় সজ্জিত আছে। প্রতি পত্রে ১৬ হইতে ২৮টি পর্য্যন্ত পংক্তি পিপীলিকার সারির ন্যায় শোভমান। অক্ষরের ছাঁদ দেখিলে চক্ষে জল রাখিতে পারা যায় না। জানিনা কোন জাতীয় লেখনীতে প্রেমের মসী মাখাইয়া অক্ষরগুলির সংস্থান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পত্রগুলি প্রস্থে প্রায় ৬ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ১২ইঞ্চি হইতে পারে।

প্রতি পত্রের পার্শ্ব দেশে প্রত্যেক পংক্তির নাম সংখ্যা দিয়া নিম্নে একটি করিয়া মোট সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল। (৭২) বাহাত্তরখানি পাতা এইরূপে দুই পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। তবে পাতা জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় পার্শ্বস্থ সংখ্যাঙ্কগুলির সর্ব্বত্র উদ্ধার করিতে পারা যায় না। তথাপি ধরিলে নাম সংখ্যা লক্ষ প্রায় হইবে।”

গোরাগোরাগোরাগোরাগোরাগোরাগোরাগোরা।
গোরাগোরাগোরাগোরাগোরাগোরাগোরাগোরা।
গোরাগোরাগোরাগোরাগোরাগোরাগোরাগোরা।
গোরাগোরাগোরাগোরাগোরাগোরাগোরাগোরা।

(‘শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী’—১৩৩৫ সালের ভাদ্র সংখ্যা।)

২। শ্রীল বাবাজি মহারাজের রচিত “শ্রীশ্রীমদদ্বৈত প্রভুর ভাব-বিচার” নামক বাংলা কবিতা—যাহা ‘শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী’ পত্রিকায় ১৩৩৫ সনের ভাদ্র সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

“ইহাতে জানি-য়ে শ্রীলাদ্বৈতের মহিমা।
শ্রীচৈতন্যাদ্বৈতরূপ মদদ্বৈত ধামা॥
সর্ব্ব সম্ভবয় তাঁরে যে যাহা কহয়।
রাধা কৃষ্ণেরে দ্বৈতরূপ জানিহ নিশ্চয়॥
অদ্বৈতের মানসপূর্ণ করয়ে হুঙ্কার।
কি জানি কি হয় তিঁহো কি শক্তি তাহার॥
সভে বলে দাস্য ভাবের এই হয় সীমা।
কেহ নাহি পায় ইহার অনুগত বিনা॥
সখ্য ভাব যবে প্রভু করে প্রকাশন।
নানা ভঙ্গি করি বলে নানান বচন॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে বঙ্গরঙ্গে নৃত্যগান।
সভে বলে মদদ্বৈত সখ্যের প্রধান॥

যে কালে শ্রীলাদ্বৈত বাৎসল্য প্রকাশে।
গৌরাঙ্গ তারে গুরু করি মানে বহুল্লাসে॥
নানারঙ্গে লালন করে গৌরাঙ্গে অদ্বৈত।
সভে বলে বাৎসল্যে প্রধান অদ্বৈত॥
কান্তাভাব যবে প্রভু করে প্রকটন।
সভে বলে মোর কান্ত শচীর নন্দন॥
সর্ব্বভাবে হৈয়া প্রভু শ্রীঅঙ্গে ভূষিত।
বহু ভাতি নৃত্য গায় রসময় গীত॥
মৃদুমন্দ হাসি আধ বঙ্কিম নয়ানে।
রসে পূর্ণ হইয়া চাহে গৌরাঙ্গের পানে॥
এক সঙ্গে নাচে দুঁহে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
সুমধুর গান করে পারিষদ ভৃঙ্গে॥
এককালে নয়নাগোচর না করয়।
মহাপ্রভু সঙ্গে প্রভু সদা বিহরয়॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু আর দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ।

৩। সিদ্ধ বাবার শ্রীহস্ত লিখিত পুঁথি হইতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "শ্রীমদ গৌরাঙ্গ নামের সপ্তবিংশতি নামামৃত স্তোত্র" 'শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী' পত্রিকায় ১৩৩৫ সালের আশ্বিন মাসে মুদ্রিত হইয়াছিল—

লক্ষী বিষ্ণুপ্রিয়াকান্তো বালানাং নববল্লভঃ।
গৌরাঙ্গসুন্দরঃ শ্রীমদ্‌রমণেন্দ্রশিরোণিঃ॥
রতিকৌশলকান্তৈকো রসাস্বাদবিশারদঃ।
নবদ্বীপনবোঢ়ানাং সর্বেবন্দ্রিয়সমাশ্রয়ঃ॥
নাগরেন্দ্রশিরোরত্নং রসকেলিসুপণ্ডিতঃ।
বধূটীনাং মনোহারী নটেন্দ্রো নটিনী প্রিয়ঃ॥

বাদ্যসঙ্গীতসম্বন্ধানন্তানঙ্গকলাস্পদম্।
কিশোরী নাম শেষানাং কুচকুঙ্কুমলাঞ্ছিতঃ।
অরুণোদয়তঃ পূর্ব্বং বিলিনে কুসুমাবৃতে।
রমণীবেশরঙ্গেণ বালাভীরতিলম্পটঃ।
জাহ্নবীজলকেল্যাদৌ তাসাং সঙ্গমহোৎসবঃ।
শ্রীলক্ষীকৃতভোজ্যান্ন ভোজনামোদবর্দ্ধনঃ॥
রঙ্গিণীসঙ্গমোৎসাহী নব্যাহ্লাদরসপ্রদঃ।
প্রেমানন্দনিধেরিন্দুঃ সখীনামেকজীবনম্॥
সৌন্দর্য্যামৃতলাবণ্যসারাকারঃ পরাৎপরঃ।
মোহিনামোহনাকারানন্তানঙ্গেশ্বরেশ্বরঃ॥
অতিধীরললিতেন্দ্রো বালাস্যাব্জমধুব্রতঃ।
সুন্দরীনামসংখ্যানাং প্রাণরক্ষাদিকারণম্॥
ইত্যেবং প্রাণবন্ধোঃ শ্রীগৌরাঙ্গস্য মহাত্মনঃ।
আনন্দবিগ্রহস্যৈতৎ সপ্তবিংশতি নামকম্॥
ইতি শ্রীমচ্চৈতন্যদাস্যাঃ শ্রীমুখেন্দোর্বিনিঃসৃতঃ রসিকেন্দ্র
শিরোমণে গৌরাঙ্গস্যসপ্তবিংশতিনামামৃতস্তোত্রং
সম্পূর্ণং॥"

৪। শ্রীমচ্চৈতন্য দাস বাবাজি মহাশয়ের রচিত এবং স্বহস্তলিখিত বাংলায় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রত্যঙ্গ বর্ণন" 'শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী' পত্রিকায় কার্ত্তিক মাসে মুদ্রিত হয়ঃ—

"ধন্য ধন্য ধন্য ধন্য রসময় শ্রীচৈতন্য,
রূপ কোটী মদন জিনিয়া।
দেখিয়া কেশের ঠাণ উছলে যুবতীর প্রাণ,
বন্ধ নব কুসুম দাম দিয়া॥
ললিত মুরতি রসাধার।

দেখিয়া রঙ্গিণীর সার রস রতির আকার
হৃদে উঠে অনঙ্গ পাথার ॥
শ্রীবদনের শোভা দেখি অমল চাঁদ লক্ষ কোটি
কান্দে গোরার পদনখে পড়ি।
চঞ্চল নয়ন দেখি, নটসার খঞ্জন পাখী,
পলায়ল লাজে মুখ মোড়ি ॥
দেখি ভুরু নাসা ঠাম, দূরে পলায়ল কাম
ফুলধনু বাণ ফেলাইয়া।
কিবা সে গণ্ডের শোভা, যুবতীর মনলোভা
বিদগ্ধার জর জর হিয়া ॥
শ্রীঅধর সুবিমল, সুরাতা সুকোমল,
মৃদু হাসি সুচন্দ্র কিরণ।
তাহে মৃদু আধ বাণী, পিরীতি হিল্লোল জিনি,
দেখি বাউলিনী সতীগণ ॥
পিরীতি সাগর ছানি, রসের হিল্লোল আনি
তাহে ছানি অসংখ্য অনঙ্গ।
সুউজ্জ্বল রস তায়, দিয়া কোন বিধাতায়
গড়িয়াছে নবীন গৌরাঙ্গ ॥
সুরঙ্গ রভস আনি, মাজিয়াছে গা খানি
বিনোদ ছানিয়া কৈল বুক।
দেখি চতুরিণী রমণ, বিদগ্ধার শিরোভূষণ
অঙ্গ বিলাসিনী মনসুখ ॥
ও নব কুসুম মাল, বক্ষোপরি শোভেভাল
চন্দনে চর্চ্চিত কিবা তায়।
ভুজসার স্বর্ণার্গল, রাতা পদ্ম করতল
উদর সুকোমল তুঙ্গ হয় ॥

কিবা মধ্য ক্ষীণ অতি, ত্রিবলি বন্ধন তটি
নিতম্বে রঙ্গিণী চিত্ত ক্ষোভে।
শুক্লবাস পরিধান, কিবা কোঁচানির মান
চলিতে সতীর চিত লোভে॥
উরু যুগ্ম অতি চারু, জিনি বাম রম্ভা তরু
পূর্ব্ব অনুক্রমে স্থূল রূপ।
জঙ্ঘা দুটি মনোহর, নারী চিত্ত করি বর
বন্ধনের আলাপ স্বরূপ॥
নখর রঞ্জিত পদ, ধরণীর সুসম্পদ
রমণীর সরস পরাণ।
শ্রীচৈতন্য দাসী বলে, মোর মন ঐ পদতলে
আকিঞ্চন তাহে পরমাণ॥

কৃষ্ণনগরের মহারাজ গিরিশচন্দ্র। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণবদ্বেষী বলিয়া কথিত আছে। বিশেষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সবিশেষ গৌরাঙ্গদ্বেষী ছিলেন। তিনি ও তাঁহার বংশপরম্পরা নবদ্বীপাধিপতিগণের সহিত, কাজেই নবদ্বীপবাসী গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর শ্রীমূর্ত্তিকে ছয়মাস কাল মৃত্তিকাভ্যন্তরে লুক্কাইত রাখিতে হইয়াছিল, মণিপুরের গৌরভক্ত মহারাজ এই সংবাদ শুনিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে পত্র লিখিয়া ভয় দেখান,—তবে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রকাশ্য ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হন। এ সকল কথা এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। কৃষ্ণনগরের রাজা যখন গিরিশচন্দ্র, তখন সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপ আশ্রয় করেন। রাজা গিরিশচন্দ্রও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি নবদ্বীপে পণ্ডিতবর্গের এক বৃহতী সভা আহ্বান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রভুর অবতার সম্বন্ধে বিচারপ্রার্থী হন। ৺পোড়ামাতলায় এই সভার অধিবেশন হয়। নবদ্বীপের এবং বঙ্গদেশীয় বহু পণ্ডিত এই সভায় নিমন্ত্রিত হন। তৎকালিন নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতদ্বয় ৺ব্রজনাথ ও ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় এই সভার উদ্দেশ্য বুঝিয়া দুই পক্ষ অবলম্বন করেন। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অবতারের স্বপেক্ষ থাকেন, অপর পক্ষে থাকেন ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। দুই দিন ধরিয়া সভার বিচার হইল,—রাশিরাশি পুঁথিপত্র সভাস্থলে আনয়ন করা হইল, শাস্ত্রের বিচার ও তর্কে কিছুই স্থির হইল না, পণ্ডিতে পণ্ডিতে মহাকলহ বাঁধিল, শ্রোতৃমণ্ডলীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, সভাস্থলে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। রাজা গিরিশচন্দ্র বিরক্ত হইলেন, নবদ্বীপে পণ্ডিতমণ্ডলীর মনে ভয় হইল, কারণ তাঁহারা রাজ-বৃত্তিভোগী ; মূল কথার কোনরূপ মীমাংসা হইল না দেখিয়া সুচতুর গৌরভক্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় রাজা গিরিশচন্দ্রের নিকট বিনীতভাবে কহিলেন,—"রাজন্। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অবতার তত্ত্ব তাঁহার কৃপাপাত্র ভক্তগণই বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত আছেন। এই নবদ্বীপে অতি প্রাচীন একটি সাধু বৈষ্ণব আছেন, তাঁহার নাম চৈতন্য দাস বাবাজি, যদি আদেশ করেন, তাঁহাকে একবার সভাস্থলে আহ্বান করিলে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া রাজা গিরিশচন্দ্র বাবাজি মহাশয়কে সভাস্থলে আহ্বান করিতে আদেশ দিলেন। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বয়ং গিয়া তৎক্ষণাৎ চৈতন্যদাস বাবাজিকে সভাস্থলে লইয়া আসিলেন ; রাজা গিরিশচন্দ্র প্রকৃত বৈষ্ণবসাধু কখন দেখেন নাই ; বাবাজি মহাশয়ের অপূর্ব্ব তেজোময় বপু, সহাস্য বদন, পরিধানে বহির্বাস, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত, প্রশস্ত ললাটে উজ্জ্বল তিলক, গলদেশে ত্রিকণ্ঠি পুষ্ঠ তুলসীর মালা, হস্তে হরিনামের ঝোলা, দেখিয়া তিনি সপার্ষদে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে সম্মান করিলেন। "হরে কৃষ্ণ" "হরে কৃষ্ণ" নাম করিতে করিতে

তিনি যখন পণ্ডিতমণ্ডলী পরিবেষ্টিত সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন, সভাস্থ সকলের দৃষ্টি এই প্রাচীন বৈষ্ণব সাধুটির উপর পতিত হইল। রাজা গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে সসম্মানে প্রশ্ন করিলেন "বাবাজি মহাশয়! আপনাদের শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার সম্বন্ধে প্রমাণ কি? "গৌরাঙ্গ ভগবদ্‌ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ" এ কথা সম্বন্ধে আপনার কি বলিবার আছে"? বাবাজি মহাশয় প্রথমে এ কথার উত্তর না দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ করিলেন এবং করযোড়ে তাঁহার বন্দনা করিলেন। তৎপরে এই তেজস্বী বৈষ্ণব সাধু রাজাকে কহিলেন, "রাজন্! কৃপা করিয়া এ দীনহীনের একটি কথা শুনুন! শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অবতার সম্বন্ধে আমারওপূর্ব্বে আপনারমত সন্দেহ ছিল। তিনি ঈশ্বর কি ভক্ত। তিনি পূর্ণ কি অংশ.—এ সম্বন্ধেঘোর সন্দেহ ছিল; কিন্তু আজ আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যে অবতার তাহা আজ আমার বিশ্বাস হইল। এ বিশ্বাসের মূল আপনিই, অতএব আপনাকে ধন্যবাদ"। রাজা গিরিশচন্দ্র বাবাজি মহাশয়ের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীও কিছু বুঝিলেন না, সকলেই বাবাজির মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। রাজা গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "বাবাজি মহাশয়! আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিলাম না, আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন কিরূপে আপনার সংশয় দূর হইল।" তখন চৈতন্যদাস বাবাজি করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "রাজন্! আমার বিশ্বাসের কারণ খুলিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রাচীন শাস্ত্রে দেখিতে পাই যখনই শ্রীভগবান ভূতলে অবতার গ্রহণ করেন, তৎকালীয় এবং তদ্দেশীয় নৃপতি তাঁহার বিদ্বেষী হন। ত্রেতা যুগে যখন শ্রীভগবান রামচন্দ্ররূপে অবতার গ্রহণ করেন, রাক্ষস রাজ রাবণ তাঁহার বিদ্বেষী হন। দ্বাপর যুগে যখন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অবতীর্ণ হন, কংস রাজা তাঁহার বিদ্বেষী হন। কলিযুগে শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতার গ্রহণ করেন, নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

এবং তাঁহার বংশীয় আপনিও শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্বেষী হইয়া তাঁহার অবতারের পূর্ণ পরিচয় ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছেন। ইহার উপর আপনি আর কি প্রমাণ করিতে চান? আপনি আজ আমার মনে বড় আনন্দ দান করিলেন। অতএব আপনাকে এবং সভাস্থ সকলকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি।" এই বলিয়া বাবাজি মহাশয় দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। রাজা গিরিশচন্দ্র হাস্যমুখে বাবাজি মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন, পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সভাস্থ সর্ব্বলোক বাবাজি মহাশয়ের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। প্রকৃত সাধু বৈষ্ণব দর্শনে রাজা গিরীশচন্দ্রের মনে মনে বৈষ্ণবতার বীজ রোপিত হইল, বৈষ্ণবদ্বেষের বীজ শুষ্ক হইতে লাগিল। তর্কবিচারে ভগবত্তত্ব বা তাঁহার অবতার-তত্ত্ব কখনও নিরাকৃত হয় নাই। মহাজন কবি বলিয়াছেন,—

"অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
লক্ষণ দেখি মুনিগণ করেন বিচার॥"

বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী। শ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংশ প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং বহু-দিন পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্যরূপে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি শিক্ষিত ব্রাহ্মভক্তও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য গোস্বামী মহাশয়ের সহিত মহাপ্রভুদর্শনে গমন করেন। তখন সিদ্ধ চৈতন্য-দাস বাবাজি মহাশয়কে তাঁহারা নদীয়া-নগরী বেশে দর্শন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা কহেন। তাঁহারা কেহই শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহকে প্রণাম করেন নাই, শুধু দর্শন করিয়া চলিয়া আসিতেছেন' এমন সময় সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহা-শয়ের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। ইহা দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে নিষেধ করিয়া

বলিলেন, "আমি গোস্বামীপ্রভু নহি, ব্রাহ্মণও নহি,—ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি' উপবীত ত্যাগ করিয়াছি, আমাকে তুমি প্রণাম করিতেছ কেন ?" সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় করযোড়ে উত্তর করিলেন, "প্রভু ! গৌর-আনা গোসাঞির বংশে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনি গৌরাঙ্গপ্রভুকে ছাড়িলে কি হইবে ? তিনি আপনাকে ছাড়িবেন না, আমার প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ সম্বন্ধ মানেন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনাকে তিনি কেশে ধরিয়া স্বধর্ম্মে আনিবেন"। গোস্বামী মহাশয় হাসিয়া কহিলেন "বাবাজি ! দেখা যাইবে তোমার কথা ঠিক হয় কি না, যদি ঠিক হয় ত আবার এইখানেই দেখা হবে।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে যখন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বধর্ম্মে আসিলেন, তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দুইজনে কত রসকথা হইল—পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া গোস্বামী মহাশয় বাবাজি মহাশয়কে বহু সম্মান করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে গোস্বামী মহাশয়ের সমাধি হইল,—সঙ্গে সঙ্গে বাবাজি মহাশয়েরও সমাধি হইল। উভয়কে লইয়া ভক্তবৃন্দ মহা ব্যতিব্যস্ত হইলেন। মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে উভয়ের সমাধি ভঙ্গ হইল। তাহারপর তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান হইলে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মধুর নয়নরঞ্জন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোকে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। নদীয়া নাগরীভাবে দুইজনই উন্মত্ত। শ্রীগৌরাঙ্গমন্দিরে প্রেমানন্দের উৎস উঠিল। যে কয় দিবস প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীধামে ছিলেন, প্রতিদিন ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন, নাগরীভাবের নানাকথা হইত। গোস্বামী মহাশয় যেদিন বাবাজি মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, সে দৃশ্য বড় করুণ,—বড়ই প্রাণস্পর্শী, উভয়কে

উভয়েই প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বহুক্ষণ অঝোরনয়নে ঝুরিলেন। পরে উভয়ে উভয়কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গনের সর্ব্বলোক উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

"ভক্তি" শব্দ শ্রবণে বাবাজি মহাশয়ের সাত্ত্বিক বিকার।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন তিনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সেই সময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ে কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর গোস্বামীপ্রভু বাবাজি মহাশয়কে "ভক্তি" সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলেন। "ভক্তি" এই শব্দটি শ্রবণ মাত্রেই বাবাজি মহাশয়ের শরীরে সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ সকল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল, তাঁহার মস্তকের শিখা উচ্চ হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ পুলকাবলীতে পূর্ণ হইল নয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। তিনি গোস্বামী প্রভুর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—কোন উত্তরই করিতে পারিলেন না। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 'ভক্তি' সম্বন্ধে বাবাজি মহাশয়ের এরূপ ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, তাঁহার আর কিছু শুনিবার আকাঙ্খাই রহিল না। তিনি বাবাজি মহাশয়ের শ্রীমূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমন্ত ভক্তিদেবীর আবির্ভাব দেখিতে পাইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীই ভক্তিস্বরূপিণী। তিনিই মূর্ত্তিমতী ভক্তি। এ সিদ্ধান্ত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ইহা লিখিত আছে। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী ভক্তিরূপেই দেখিতেন। তাঁহারই অনুগত হইয়া নাগরীভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করিতেন। 'ভক্তি' শব্দ শ্রবণমাত্রেই তাঁহার হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ামূর্ত্তি স্ফুর্ত্তি হইল, আর সর্ব্বশরীরে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ জীববল্লভ। সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়ের সিদ্ধান্তগুলি অতি সুন্দর। শ্রীশ্রীভগবানের একটি নাম "বহুবল্লভ"। এ কথাটি গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু "জীববল্লভ" এ কথাটি কোথাও দেখিতে পাই না। সিদ্ধ চৈতন্যদাস শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের একটি নূতন নাম দিয়াছিলেন, "জীববল্লভ"। তিনি বলিতেন শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম গোপীবল্লভ, অর্থাৎ তিনি ব্রজগোপীকাগণের প্রাণবল্লভ ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর "জীব-বল্লভ"। "জীব" শব্দের অর্থ স্ত্রী পুরুষ উভয়েই—'গোপী' শব্দের অর্থ গোপ-স্ত্রীগণ, ইহা স্ত্রিলিঙ্গ-বাচক। নদীয়ানাগরীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই আছেন, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নাম "জীব-বল্লভ" অতি সুন্দর কথা। শ্রীকৃষ্ণ গোপীবল্লভ, কারণ তিনি গোপাঙ্গনাগণের বল্লভ আর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর পুরুষ ও স্ত্রী উভয় ভক্তনাগরীবৃন্দের বল্লভ, এজন্য তিনি জীববল্লভ।

সিদ্ধবাবাজি মহাশয় বলিতেন,—শাস্ত্র বিধি অনেক স্থলে সাধকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া দেয়; রাগ—অর্থাৎ অনুরাগ ভজনে সে সন্দেহ দূর হয়। উপদেশও বহুবিধ, মহাজনও অনন্ত, কাহার উপদেশ শুনিব, কাহার না শুনিব, এই সন্দেহে পড়িয়া বহু সময় নষ্ট হয়। এবং সন্দেহ ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়; রাগের ভজনে মনে সকল সন্দেহ দূর করে, সর্ব্বশাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত রাগমার্গের ভজন; শ্রীমন্মহাপ্রভু এই রাগের ভজনই শিক্ষা দিতে নদীয়ায় অবতীর্ণ হন। তাহা না হইলে তাঁহার আসিবার প্রয়োজনই ছিল না। এই বলিতে বলিতে বাবাজি মহাশয় প্রেমে অবসাঙ্গ হইয়া গান ধরিলেন,—

বেলি অবশানে, ননদিনী সনে, জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ নিরখিয়া কলসী ভাঙ্গিয়া এনু॥

তাঁহার রাগমার্গের সাধনার ফল সকলেই জানেন। একদিন মাঘ মাসে গানের সময় শ্রীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে কীর্ত্তন গান

হইতেছে, বহুলোক এবং ভক্তবৃন্দ শুনিতেছেন। একদল কীর্ত্তনীয়া যাইতেছে, আর একদল আসিতেছে, রাত্রিতে একদল কীর্ত্তনীয়া আসিয়া মাথুরের পালা গাহিতে আরম্ভ করিল। গৌরচন্দ্রিকার পদ ধরিল "নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গসুন্দর"। সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি দিবানিশি নবদ্বীপরসে মগ্ন থাকিতেন,—নদীয়ার চাঁদ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভকে নদীয়া ছাড়া করিতে তিনি কিছুতেই রাজি নহেন। গৌরচন্দ্রিকায় প্রথম পদাংশ শুনিয়াই তাঁহার মনে বিষম ধাক্কা লাগিল,—অমনি তিনি মহাক্রোধ বশে দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া হাতে একগাছি বংশযষ্টি লইয়া কীর্ত্তন গায়কের সম্মুখেই, "ঐ জীবের জীবন নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, পুনরায় যদি ঐ কথা বল তোমাকে মারিয়া দূর করিয়া দিব।" এই বলিয়া বংশযষ্টি দিয়া কীর্ত্তনীয়াকে মারিতে উদ্যত হইলেন। তখন নাটমন্দিরে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল, সেবাইত গোস্বামীগণ আসিলেন,—সাধক ভক্তবৃন্দ জুটিলেন, সকলে মিলিয়া সিদ্ধবাবাজি মহাশয়কে প্রবোধ দিয়া সুস্থির করিলেন। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর কাঁপিতেছে,—নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বহিতেছে। কীর্ত্তনীয়ার গান বন্ধ হইল, তিনি অন্য পালা ধরিলেন। সেই হইতে বহুদিন শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে মাথুর লীলা গান কেহ করেন নাই। এখন সে রামও নাই,—সে অযোধ্যাও নাই,—যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিতেছেন।

শ্রীধামে সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজির সহিত মিলন।

শ্রীপাট অম্বিকাকালনার সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজির নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলে কাহারও অবিদিত নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে কালনা হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিতেন। তিনি সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয়ের সমসাময়িক লোক। দুইজনে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল, উভয়ের ভজনপ্রণালী বিভিন্ন হইলেও গৌরাঙ্গৈক নিষ্ঠতা উভয়েরই তুল্য ছিল। শ্রীধামে তাঁহাদিগের প্রথম মিলন অতি মধুর। এই

মধুর মিলনকাহিনীটি আমি নবদ্বীপবাসী শ্রীদুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। তিনি ইহা শুনিয়াছিলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপরিবার গৌরধামগত গোস্বামীপাদ রতনলালের নিকট।

সকলেই জানেন সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি নদীয়া-নাগরীবেশে গৌরপ্রেমে সর্ব্বদা ডগমগ থাকিতে একদিন তিনি মনোহর নাগরীবেশে সজ্জিত হইয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিতেছেন, এমন সময়ে সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজি মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভু দর্শনে শ্রীমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহু ভক্ত ও শিষ্যগণ আসিলেন। ভগবানদাস বাবাজিকে নবদ্বীপশুদ্ধ লোক সকলেই জানেন এবং সবিশেষ শ্রদ্ধা করেন। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে আসিলে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি শুনিলেন কালনার সিদ্ধবাবাজি আসিয়াছেন। তিনি শ্রীমন্দির মার্জ্জনা সেবা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি জানিতেন কাল্‌নার সিদ্ধবাবাজি পরম গৌরভক্ত। তাঁহার গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার কথাও তিনি শুনিয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নদীয়ানাগরীভাবাপন্ন সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির প্রাণে কি এক হিংসার অপূর্ব্ব ভাব উদ্রেগ হইল। তিনি ভাবিলেন তাঁহার প্রাণবল্লভ নদীয়ানাগর শ্রীগৌরসুন্দরকে বুঝি তিনি ভুলাইয়া কাল্‌নায় লইয়া যাইবেন। সপত্নীভাবে বিদ্বেষপূর্ণ হৃদয়ে তিনি একবার ভগবানদাস বাবাজি প্রতি অতিশয় রোষকষায়িত লোচনে চাহিলেন। তাঁহার হস্তে তখন পর্য্যন্ত সম্মার্জ্জনী ছিল। সর্ব্বসমক্ষে তিনি সেই সম্মার্জ্জনী হস্তে ছুটিয়া আসিয়া সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজিকে কহিলেন, "ওলো গৌরভাতারী কালামুখী পেত্নী! তুই আমার প্রাণবল্লভকে ভুলাইয়া কালনায় লইয়া যাইতে এসেছিস। শীঘ্র বাড়ীর বাহির হও, নতুবা এই ঝাঁটা দিয়া মারিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিব"। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া শ্রীমন্দিরে উপস্থিত

সর্ব্ব ভক্তগণ আশ্চর্য্য হইয়া উভয় বাবাজির মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন, কেহ কোনও কথা বলিতে সাহস করিতেছেন না। সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজির সঙ্গী ভক্তবৃন্দ, এবং শিষ্যগণ মনে বড় দুঃখ পাইলেন, তাঁহাদের মনে মনে রাগও হইল। কিন্তু কাল্‌নার বাবাজির প্রসন্ন বদন, মুখে হাসি ও স্থির ভাব। তিনি চৈতন্যদাস বাবাজির মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াই মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, এবং ভঙ্গী করিয়া প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার বাম হাতখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কহিলেন "সতীন! তুমি এত রাগ করিতেছ কেন? আমি তোমার প্রাণবল্লভকে নদীয়া ছাড়া করিতে চাহি না, তবে তিনি তোমাকে লুকাইয়া কোন কোন দিন কাল্‌নায় পলাইয়া যান। তুমি দিদি! সাবধানে তাঁহার চালচলনের উপর নজর রাখিও এবং নিজে সতর্ক হইও। আপনার ঘরের লোক তুমি ঠিক রাখিতে পার না, পরকে গাল দিলে বা ঝাঁটা মারিলে কি হইবে?" সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজি এই কথা শুনিয়া রাগে ও অভিমানে গরগর হইয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীবদনের প্রতি প্রণয়রোষকষায়িত নয়নে চাহিয়া সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন 'আচ্ছা! তোমাকে আমি দেখিয়া লইব। ছি ছি! এই তোমার কাজ! তুমি বড় অবিশ্বাসী। এত করিয়াও তোমার মন পাইলাম না। তোমার যদি অপরা স্ত্রীলোকের প্রতি মন চাহে, তাহা আমাকে বলনা কেন? আমি না হয় কুট্‌নীর কাজই করিব! তোমার জন্য আমি সব করিতে পারি তা কি তুমি জান না?

এই বলিয়া বাবাজি মহাশয় অভিমানিনী নদীয়ানাগরীভাবে প্রণয় রোষে গরগর করিতে করিতে নিজ কুটীরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এই পরম রসমাধুর্য্যপূর্ণ অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজি চৈতন্যদাস বাবাজির কুটীর দ্বারে গিয়া ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া আরও কত কি অপূর্ব্ব রসকথা শুনিতে লাগিলেন। কুটীরাভ্য-

স্তুরে ভুমিশয্যায় শয়ন করিয়া চৈতন্যদাস বাবাজি কত কি আপন মনে তাঁহার প্রাণবল্লভকে বলিতেছেন, আর তাঁহার অভিমানের ক্রন্দনরোল বহির হইতে শুনা যাইতেছে। এইরূপ কতক্ষণ গেল। পরে দ্বার খুলিয়া ভগবানদাস বাবাজিকে তিনি গৃহের মধ্যে লইয়া পুনরায় দ্বার বন্ধ করিলেন।

ইহার পর দুই সতিনে একত্র হইলেন। দুইজনেই নাগরীভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের সম্মুখে হাত ধরাধরি করিয়া নয়নরঞ্জন প্রেমনৃত্য করিতে লাগিলেন। দুইজনে সুরে সুর মিলাইয়া প্রেমসঙ্গীতের ধুয়া ধরিলেন,—

কি ক্ষণে দেখিনু গোরা, নবীন কামের কোঁড়া
সেই হতে রৈতে নারি ঘরে।
কত বা করিব ছল, কত বা ভরিব জল,
কত যাব সুরধুনী তীরে॥
বিধি! তো বিনে বলিতে কেহ নাই। ধ্রু॥
যত গুরু গরবিত, গঞ্জন বচন কত,
ফুকরি কান্দিতে নাহি ঠাঁই।
অরুণ নয়ন কোনে, চাঞা ছিল আমা পানে
পরাণে বড়শী দিয়া টানে।
কুলের ধরম মোর, ছারখারে যাক্ গো—
না জানি কি হবে পরিণামে॥
আপনা আপনি যাইনু, ঘরের বাহির হৈনু,
শুনি খোল করতালের নাদ।
লক্ষ্মীকান্ত দাস কয়, মরমে যার লাগয়,
কি করিবে কুল পরিবাদ॥

শ্রীমন্দির হরিধ্বনিতে মুখরিত হইল. উপস্থিত ভক্তবৃন্দ পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইলেন।

সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজি শ্রীবৃন্দাবন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আর একবার শ্রীধামে আসিয়া চৈতন্যদাস বাবাজিকে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—তিন দিন জল্পনা ও সাধ্যসাধনার পর উভয়ে একত্রে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন স্থির হইল। যাত্রার দিন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার প্রাণবল্লভের নিকট বিদায় লইয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারে আসিয়াই সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী হঠাৎ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, —তিনি একেবারে সংজ্ঞাশূন্য নিশ্চল ভাবে ভূমিতলে পতিত রহিলেন, বহুলোক সংঘট্ট হইল। হরিনাম সংকীর্ত্তনেও তাঁহার চেতনা হইল না, দেখিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবারবর্গ সকলে মিলিয়া তখন গৌরকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাহার পর বাবাজির মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। সিদ্ধ ভগবান-দাস বাবাজি বলিলেন কাজ নাই তোমার বৃন্দাবনে যাইয়া—নবদ্বীপই তোমার বৃন্দাবন"। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি কিছু লজ্জিত হইলেন, কিন্তু মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন "তুমি আমার প্রকৃত সতিন কি না, তাই আমাকে ভুলাইয়া দেশ ছাড়া করিতে আসিয়াছিলে। ইহাতে তোমার সুবিধাই হইত"।

ভক্তি শাস্ত্রে অধিকার। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয় ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিদ্বান ছিলেন না, কিন্তু ভক্তি শাস্ত্রের তত্ত্ববিচারে সুদক্ষ ছিলেন। লোকে বলিত ইনি না পড়িয়া পণ্ডিত। বহু পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্থ হইতেন। শাস্ত্রের কূট তর্কগুলি বাবাজি মহাশয় সরল ও সরস কথায় এমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, যে পণ্ডিতগণ আশ্চর্য্য হইতেন। তাঁহার অঙ্গের বাতাস লাগিলেই পণ্ডিতগণের তর্কবুদ্ধি যেন লোপ পাইত, তাঁহার সহিত কথা কহিলেই আর তর্ক করিতে প্রবৃত্তি হইত না। যিনি যে বিষয় লইয়া আসুন না কেন, বাবাজি মহাশয় তাহার সুন্দর সমন্বয় করিয়া দিতে পারিতেন।

"একটি বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহার নিকট একদিন প্রশ্ন করিলেন" বাবাজি মহাশয় ! গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী রাধাশক্তি, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর মধুর ভজন পরকীয়াভাবে গদাধরের সহিত সিদ্ধ, এরূপ গোস্বামীপাদ-গণ বলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত প্রভুর স্বকীয়ভাবে ভজনও ত কেহ স্বীকার করেন না"। বাবাজী মহাশয় বড় রসিক পুরুষ ছিলেন, তিনি একটু ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন "ওরে মূর্খ ! তোরে আর কি বলিব ! এ সকল কথা যাঁরা বলেন তাহাঁরা প্রভুর রসিক, ভক্ত নহেন। পুরুষে পুরুষে কি প্রেম হয়, নারী-পুরুষেই প্রেম হয়। গদাধর রাধা নহেন —রাধাশক্তি। শ্রীরাধিকার শক্তি লইয়া তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াই মা ও রাধা একাধারে। স্বকীয়া পরকীয়া উভয় ভাবেই তিনি শ্রীগৌরঙ্গ ভজন করিয়াছিলেন। মহা-জনগণ একথা খুলিয়া বলেন নাই কেন তা জানিস্। প্রভুর আদেশ ছিল প্রকট কালে তাঁহাকেই গুপ্ত রাখিতে, কারণ তিনি কলির প্রচ্ছন্ন অবতার। ব্যাসবাক্য ঠিক রাখিতেই হইবে। প্রভুর যখন ইচ্ছা নহে যে তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করেন, তখন কাহার সাধ্য তাঁহার বক্ষ বিলাসিনীকে প্রকাশ করে, বা তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করে ? এখন প্রভুর অপ্রকটে তাঁহার আদেশেই প্রিয়াজীর তত্ত্ব গৌরভক্তগণ প্রকাশ করিতেছেন"। বৈষ্ণবটি শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি আর শাস্ত্রের কথা উঠাইতে পারিলেন না।

দিনাজপুরের রাজা। দিনাজপুরের রাজা রায়সাহেব কমল-লোচন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি সৈন্যসামন্ত লইয়া ২৫ খানি সুসজ্জিত নৌকা সহ সপরিবারে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ দরশনে আসিয়া ছিলেন। শান্তিপুরে রাজার গুরুপাট, তিনি শান্তিপুর হইয়া আসিয়াছেন, অথচ সেখানে নামিয়া শ্রীগুরুর চরণ দর্শন করেন নাই। অপরাহ্নে রাজাবাহাদুর সপরিবারে সৈন্য সামন্তসহ শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে আসিলেন। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গমন্দিরের

দ্বারদেশে গিয়া রাজাবাহাদুরকে কহিলেন "তুমি শ্রীগুরুপাট দর্শন না করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে আসিয়াছ। শ্রীপ্রভু তোমাকে দর্শন দিবেন না, সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপাট দর্শন করিয়া এস, তবে তাঁহার দর্শন পাইবে"। উপস্থিত সকলেই বাবাজি মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেবাইত গোস্বামীপাদগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও কিছু বলিতে পারিলেন না। রাজার অনুচরগণ বাবাজির এইরূপ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইল, সৈন্যগণ তরবারি খুলিল। রাজাবাহাদুর ভক্তিমান পুরুষ, বাবাজি মহাশয়ের কথার মর্ম্ম বুঝিয়া সকলকে অশান্ত হইতে নিষেধ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীমন্দিরদ্বার ত্যাগ করিয়া নিজ বাসায় ফিরিলেন। পরে শ্রীগুরুপাট দর্শন করিয়া আসিয়া তবে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিলেন। বাবাজি মহাশয়কে তিনি বিশেষ সন্মান করিলেন এবং তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয়ের এইরূপ প্রভাব ছিল। তিনি মহাপ্রভুর প্রসাদ ভিন্ন অন্য কাহারও গৃহে ভিক্ষা করিতেন না। বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র দুই দিন, শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব দিবসে শ্রীঅদ্বৈতমন্দিরে ও শ্রীনিত্যানন্দ-মন্দিরে গিয়া প্রসাদ পাইয়া আসিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ অগ্রে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া তবে তিনি ভিক্ষায় যাইতেন। শ্রীনিত্যানন্দ জন্মোৎসবে তিনি সকলকে বলিতেন "আজ আমার ভাসুরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ"। তাঁহার প্রাণবল্লভ বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ। এই সম্বন্ধ তিনি কায়-মনোবাক্যে যথাবিধি সংরক্ষণ করিতেন।

ফাল্গুণ মাসে দোলযাত্রা। শ্রীধাম নবদ্বীপে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজিকে সকলেই ভক্তি ও সন্মান করিতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব নদীয়া নাগরীভাবে সকলেই মুগ্ধ হইতেন, তাঁহার স্ত্রীবেশ দেখিয়া সকলেই আনন্দ পাইতেন। গৌরাঙ্গ-নাগরীভাবে এখন যেমন কেহ কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কটাক্ষ করেন, তখন সেরূপ ভাব কাহারও

ছিল না। শ্রীল কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় মধ্যে মধ্যে বাবাজি মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিতেন,—উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। বাবাজি মহাশয় নিজ স্বভাবসিদ্ধ নাগরীভাবেই সর্ব্ব লোককে মুগ্ধ করিতেন। যিনি যেমন, তাঁহার সহিত তেমন ভাবের কথা কহিতেন; নিজ ভাব তিনি কখন গোপন করিতেন না। এই জন্যই সর্ব্ব গৌরভক্তগণের তিনি পূজ্য ছিলেন।

ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রার সময় এবং শ্রাবণ মাসে ঝুলনের সময়, তিনি মনোহারিণী নদীয়া-নাগরীবেশে সজ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-বাটীর নহবতখানার নিম্নের কুটীরে তাঁহার প্রাণনাথ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের সম্মুখীন হইয়া হিন্দোলে আরোহণ করিয়া ঝুলিতেন, উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাঁহার দোলার পশ্চাতে থাকিয়া সজোরে দোল দিতেন, তাঁহাকে আবির মাখাইয়া দিতেন, তিনি পরমানন্দে দুলিতে দুলিতে গান গাহিতেন।

"ঝুলত গৌরচন্দ্র দ্বিজমনিয়া, সহ লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া"

শ্রীমন্দিরে তখন আনন্দের উৎস উঠিত। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। তিনি সুন্দরী নদীয়াবালিকাদিগকে দেখিলেই "গৌরভাতারী" বলিয়া আদর করিয়া সম্বোধন করিতেন। কখন কখন তাহাদিগকে "গৌর-ভাগ্যাও" আখ্যা দিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে তখন নবদ্বীপরসের ছড়াছড়ি হইত। তখন ত কেহ কিছু বলিতেন না।

ভীমের আত্মগ্লানি ও পরে অলৌকিক দর্শন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মন্দিরের একটি নির্জ্জন কুটীরে সিদ্ধবাবাজি থাকিতেন। সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে গৃহ মধ্যে ভজন করিয়া কাটাইতেন,—নাম জপাদি তাঁহার ভজনের অঙ্গ হইলেও তিনি গভীর নিশিতে নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত রসকথা—কহিতেন। রসিক ভক্তগণ সেই সব নির্জ্জন সংলাপ শ্রবণে পরমানন্দ পাইতেন। এই সময়ে শ্রীধামে

'ভীম' নামে এক দুষ্ট-প্রকৃতি ভীষণ লোক ছিল-সে জাতিতে গন্ধবণিক, বড় বৈষ্ণবদ্বেষী। একদিন রাত্রিতে শ্রীমন্দিরের প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক সে বাবাজি মহাশয়ের কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঐ সব রসকথা শুনিয়া মনে করিলেন—বাবাজি মহাশয় কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গ করিতেছেন—এই ভাবিয়া সে পদাঘাতে দ্বার ভঙ্গ করিয়া দেখিল কুটীর-মধ্যে জ্যোতিঃপূর্ণ—বাবাজি মহারাজ ধ্যানমগ্ন, চতুর্দিক আলোকিত, কুটীর মধ্য হইতে অপূর্ব্ব পুষ্পগন্ধ প্রসৃতি হইতেছে। দেখিয়া ভীম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছাপনোদনে আবার দেখিল পূর্ব্ববৎ শ্রীমন্দির দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, আর কোন শব্দ নাই। সে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিল এবং কয়েকদিন আত্মগ্লানি ভোগ করিয়া পরে বাবাজি মহাশয়ের নিকট আত্ম সমর্পন করিল। বাবাজি মহাশয় তাহাকে আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়া বলিলেন "ভীম! আজ হইতে তুমি গৌরদাস হইলে। তুমি হরিনাম কর ও বৈষ্ণব সেবা কর।" সেই দিন হইতে পাষণ্ড ভীম বৈষ্ণব হইল।"

("সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহারাজ" গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন।)

প্রতিষ্ঠা ও দান গ্রহণ। বাবাজি মহারাজের নিষ্কিঞ্চন ভাব, স্বাভাবিক বিনয় ও ভক্তিভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। বিড়াল, কুকুরকেও তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও তিনি ছেঁড়া কাঁথা, নারিকেল মালা এবং ব্রজের করোয়া ব্যতীত অন্য কিছু ব্যবহার করিতেন না। ক্রমে তাঁহার ভজন-বৃত্তান্ত ব্রজ ও গৌড়মণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। বহু ভক্ত-মণ্ডলী তাঁহার দর্শন লাভ করিতে শ্রীধামে আসিতে লাগিল। বহি-রঙ্গলোক অনেক অনেকে কাম্য করিয়া তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল, —অনেকে অনেক দ্রব্য-সম্ভার ও অর্থ তাঁহার চরণে দিতে আসিল; কিন্তু তিনি মহা বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী,—বিষয় তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি এ সকল দেখিয়া বিরক্ত হইয়া রোষভরে সকলকে

কহিতেন, "আমি কি গৃহ সংসার ছাড়িয়া এই করিতে এখানে আসিয়াছি? আমার সর্ব্বনাশ করিয়া তোমাদের কি সুখ হইবে? দরিদ্র বৈরাগীর ধর্ম্মনাশ করিয়া তোমাদের কি লাভ হইবে? তোমাদের দান করিবার যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে, আমার প্রাণবল্লভকে দাও, তাঁহার সেবাইত গোস্বামীগণকে দাও, তাঁহারা দেবদ্বারে দান গ্রহণের অধিকারী। তাঁহারা গৃহস্থ,—আমি বৈরাগী, আমার সে অধিকার নাই। তাঁহাদিগকে দিলেই আমার সুখ।"

উপদেশ। সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় সকলকে গৌরভজনের উপদেশ দিতেন, তিনি বলিতেন শ্রীগৌরাঙ্গভজন আগে না করিলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল ভজন সিদ্ধ হয় না—সর্ব্ববিধ ভাবে গৌরাঙ্গ ভজন করিতে তিনি-শিক্ষা দিতেন—যাহার যেমন অধিকার। তিনি বলিতেন শ্রীগৌরাঙ্গের কান্তাভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। কিন্তু এই ভাবের অধিকারী বিরল। যেমন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলভজনের অধিকারী কোটির মধ্যে একজন,—তেমনি শ্রীগৌরাঙ্গের কান্তাভাবের অধিকারী দুই কোটির মধ্যে একজন। তিনি বলিতেন বিষ্ণুপ্রিয়াই রাধা—আর গদাধর রাধাশক্তি, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অংশ। নদীয়া নাগরীগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কায়ব্যুহ। ব্রজের ভজনও যাহা, নদীয়ার ভজনও তাই। কোন অংশে কোনটিই কিছু ন্যূন নহে, কারণ গৌরকৃষ্ণ অভেদতত্ত্ব। গৌরাঙ্গভজনপরায়ণ ভক্তের পক্ষে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলভজন স্বতঃসিদ্ধ ভাব। গৌরভক্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলভজনের বিরোধী হইতে পারেন না, কারণ শ্রীগৌরাঙ্গভজনই যে রাধাকৃষ্ণ যুগলভজন। প্রকৃত গৌরতত্ত্ব যাঁহার জ্ঞান হয় নাই, তিনিই গোলে পড়েন"।

সিদ্ধবাবাজি মহাশয়ের নিকট গৌরধামগত স্মার্ত্তপণ্ডিত শিরোমণি ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বৈষ্ণব-শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে মধ্যে মধ্যে সভা হইত, এবং সেই

সভায় বাবাজি মহাশয় উপস্থিত হইয়া উপদেশ দিতেন। এরূপ একটি সভায় বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাকে তিনটি প্রশ্ন করেন যথা (১) সংসার-পীড়িত ত্রিতপাদগ্ধ জীবের ভবভয় নিবারণের উপায় কি? (২) নাম সঙ্কীর্ত্তনের রীতি কি? (৩) নামে রুচি জীবে দয়া কি করিয়া হয়? বাবাজি মহাশয় সভাস্থলে উঠিয়া করযোড়ে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—(১) "সংসারে আসিয়া জীব মায়ার বন্ধনে পতিত হয়—তাহার স্বরূপতত্ত্ব নিত্যকৃষ্ণদাসত্ব ভুলিয়া গিয়া মায়ার দাস হয়। যদি সাধু গুরু কৃপাবলে তাঁহার সৎসঙ্গ লাভ হয়—প্রকৃত গৌরাঙ্গভক্তের দর্শন লাভ ঘটে, তাহা হইলে তাহার ভবভয় দূর হয়। শ্রীগৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পন ভিন্ন ভবভয় দূর হইবার অন্য কোন উপায় নাই। (২) "তৃণাদপি সুনী চেন" শ্লোকের আচরণ না করিলে নাম সঙ্কীর্ত্তনের ফল পূর্ণভাবে প্রাপ্তি হয় না। নামাপরাধ-শূন্য হইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে হয়। (৩) জীবে দয়া না করিলে নামে রুচি হয় না, আর নামে রুচি না হইলেও জীবে দয়া হয় না। এই দুটিই পরস্পর অনুকূল সাধন। দয়া মানে দান কর্ম্মাদি নহে,—আহার ব্যবহারাদি নহে, বা সংসারিক উপকারাদিও নহে। দয়া মানে পর উপকার। পর অর্থাৎ পরম উপকার। এই পরম উপকার অর্থে দানাদি দরিদ্র সেবা নহে,—পরমার্থ লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত সদুপদেশ দানই পর উপকার। তাই কবিরাজ গোস্বামী পূজ্যপাদ এই কথাই লিখিয়াছেন, যথা,—

ভারতভূমেতে মনুষ্য জন্ম হৈল যার।
জন্ম সার্থক কর করি পর উপকার॥

সভাস্থ সকলেই সিদ্ধ বাবাজির উপদেশবাক্যে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "বল জয় বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের জয়" এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবতোক্ত এই শ্লোকটি পাঠ করিতে করিতে নিজ ভজন কুটীরে গমন করিলেন।

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥

প্যারীলাল গোস্বামী। গৌরধামগত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার শ্রীপাদ প্যারীলাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন মহাশয়ের সহিত সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির সবিশেষ সম্প্রীতি ছিল। তাঁহার উপযুক্ত পৌত্র শ্রীপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী তর্কতীর্থ সে দিন প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার পূজ্যপাদ পিতামহের সহিত সিদ্ধ বাবজি মহাশয়ের পরমার্থে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা দু'একটি যাহা বলিলেন, তাহা এ স্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

(১) প্যারীলাল গোস্বামীপ্রভু ভাগবতে পরম পণ্ডিত ছিলেন। শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংশ প্রভুপাদ শ্রীরাম গোস্বামীর নিকট যখন তিনি প্রথম শ্রীমদ্ভাগবত পাঠারম্ভ করেন, সেই সময় একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়া মধুর হাসিয়া সস্নেহে গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "গোসাঞি! তুমি ভাগবত পডিতেছে শুনিলাম, একটি ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা কর দেখি, আমি শুনি"। গোস্বামীপ্রভু তখন সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকটে বসিয়া ভাগবতের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, যথা—

"অহোবতশ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তবস্তে জুহুবুঃ সস্নুর্আর্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

অর্থ! হে ভগবান্! যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। আপনার নাম যাঁহারা কীর্ত্তন করেন তাঁহারা সমস্ত প্রকার তপ করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, সুতরাং আর্য্য মধ্যে পরিগণিত।

হরিদাস ঠাকুরের বিকট দৈন্য দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে বসিয়া এই উত্তম শ্লোকটি পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়া বলিয়াছিলেন—যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রভু কহে 'তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।

তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপোদান ॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন ॥

সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় গোস্বামীপ্রভুর মুখে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ নিস্পন্দ রহিলেন, পরে তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, "তুমি আমার প্রাণনাথের নিজ জন"। প্যারিলাল গোস্বামীপ্রভু নিজ মুখে এই কথাটি তাঁহার পৌত্রের নিকট বলিয়া গৌরব করিয়া কহিতেন "সেই হইতে আমার জীবনের গতির একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল, বৈষ্ণবাশীর্ব্বাদে আমার প্রাণে যেন একটা অভূতপূর্ব্ব গৌরাঙ্গ-প্রেমের তুফান উঠিল। ইহাকেই বলে শক্তিসঞ্চার। সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় আমাকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে গুরুতুল্য শ্রদ্ধাভক্তি করিতাম"।

(২) আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়ের নিকট প্যারীলাল গোস্বামীপ্রভু বসিয়া গৌরকথা শুনিতেছেন, এমন সময়ে একজন শ্রীনিত্যানন্দবংশীয় প্রভু সন্তান সেখানে আসিয়া বাবাজি মহাশয়কে প্রণাম ও বন্দনা করিয়া নিকটে বসিলেন বাবাজি মহাশয়ও তাঁহাকে প্রতিপ্রণাম করিলেন। প্যারিলাল গোস্বামীপ্রভুও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু তিনি আর প্রতিপ্রণাম করিলেন না। ইহা দেখিয়া স্পষ্ট বক্তা ও তেজস্বী সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় কিছু বিরক্তভাবে প্রভু সন্তানকে কহিলেন "আপনি ইহাকে প্রতি প্রণাম করিলেন না কেন? আপনি জানেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার গোস্বামীগণ আমার প্রাণনাথের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ, ইহাঁদিগের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া শক্তি নিহিত আছে"। এই কথা শুনিয়া মহা অপ্রতিভ হইয়া প্রভুসন্তানটি

প্যারিলাল গোস্বামীপ্রভুকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় এই কার্য্যে তাঁহার বৈষ্ণবীয় তেজ ও স্পষ্টবাদিত্বের পরিচয় দিলেন এবং এই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপরিবার সেবাইত গোস্বামীদিগের মহিমাকীর্ত্তন করিলেন। শুধু সেবাইত গোস্বামী বলিয়া তাঁহারা পূজ্য নহেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহাদের একটা যৌন সম্বন্ধ আছে—যাহা অন্যের সঙ্গে নাই।

(৩) আর এক দিনের ঘটনা শুনুন। আর একজন নিত্যানন্দবংশীয় প্রভুসন্তান আসিয়া বাবাজি মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়ের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি এই কার্য্য যখন করিলেন, তখন তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে এই প্রভু সন্তানটির প্রণামাদি গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রভুসন্তানটি পুনর্ব্বার প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে, প্যারিলাল গোস্বামীপ্রভু বাবাজি মহাশয়কে সংক্ষুব্ধচিত্তে কহিলেন "আপনি এ কি করলেন? প্রভুসন্তান ব্রাহ্মণ আপনাকে প্রণাম করিলেন, আপনি অম্লানবদনে গ্রহণ করিলেন প্রতিপ্রণামও করিলেন না"। বাবাজি মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন "গোসাঞি! তুমি জাননা, তিনি প্রকৃত প্রভুসন্তান নহেন,—উহাঁর বংশগত দোষ আছে, তাহা না হইলে বৈষ্ণবাদেশ মানিলেন না কেন? আমি প্রথমেই নিষেধ করিয়াছিলাম আমাকে প্রণাম করিবেন না। তথাপি তিনি ইহা করিলেন। ইহাকে আমি দৈন্য বলি না,—আত্মমর্য্যাদা রক্ষাকরণ প্রভুসন্তানদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার এই ব্যবহারে উহাঁর শিক্ষা হইবে"। বাবাজি মহশেয়ের কথা শুনিয়া প্যারিলাল গোস্বামীপ্রভু বুঝিলেন বৈষ্ণবীয় তেজ ও মর্য্যাদা রক্ষা করাও প্রয়োজন।

(৪) আর এক দিনের কথা শুনুন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে একখানি মধুচক্র হইয়াছিল। সেবাইত যুবক ও বালক গোস্বামী

সন্তানগণ একত্রিত হইয়া বাবাজি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া সেই মধুচক্রখানি ভাঙ্গিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন বাবাজি মহাশয়ের বিনা অনুমতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের কোন কাজই হইত না। প্যারীলাল গোস্বামী প্রভু অগ্রণী হইয়া সেই মধুচক্র ভাঙ্গিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তিকে বস্ত্রাবৃত করা হইল কারণ বাবাজি মহাশয় বলিলেন "আমার প্রাণনাথকে যেন মৌমাছিতে না কামড়ায়"। এই মধুচক্রে প্রায় সাড়ে তিন সের উত্তম মধু ছিল। এই মধু নিষ্কাসিত হইলে বাবাজি মহাশয় বলিলেন 'গোসাঞি! প্রাণনাথকে জাগাইয়া আজ এই মধু ভোগ দাও"। তাহাই হইল। এখন প্রসাদ পাইবার পালা। সকলেই কিছু কিছু মধুপ্রসাদ পাইলেন, কিন্তু প্রায় তিন সের মধু রহিয়া গেল। বাবাজি মহাশয় বলিলেন "আজ প্রাণনাথের অধরামৃত পেট ভরিয়া পান করিব"। প্যারিলাল গোস্বামীপ্রভু তখন তাঁহাকে মধু প্রসাদ দিলেন। বাবাজি মহাশয় দুই হস্ত অঞ্জলি পাতিয়া মধুপান করিতে লাগিলেন, আর গোস্বামীপ্রভু মধুপাত্র হইতে অনবরত মধু ঢালিতে লাগিলেন। তিন সের আন্দাজ মধু এই ভাবে একসঙ্গে সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় পান করিয়া "তৃপ্তোঽস্মি" বলিয়া হস্ত ধৌত করিলেন। সকলেই অবাক্! প্রাচীন সেবাইত গোস্বামীপ্রভুগণ এবং গোস্বামিনীগণ একথা শুনিলেন, তাহার মধ্যে প্যারীলাল গোস্বামীর পিতাও ছিলেন। সকলেই বালকবৃন্দের এই কার্য্যে দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং বাবাজি মহাশয় সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। বাবাজি মহাশয় কিন্তু নির্ব্বিকার ও নিরুদ্বিগ্ন। যথারীতি তিনি ভক্তসঙ্গ করিলেন সন্ধ্যারতি দর্শন করিলেন এবং যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদও পাইলেন। সকলে ভাবিলেন রাত্রিতে তিনি বিশেষ কষ্ট পাইবেন। কিন্তু ভজনানন্দসুখে তিনি অনায়াসে নিরুপদ্রবে রাত্রি কাটাইলেন। প্রাতে আসিয়া সকলে তাঁহাকে দেখিলেন, মালা হাতে করিয়া জপ করিতেছেন।

বৈষ্ণব ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন না, এক্ষেত্রে সিদ্ধ বাবজি মহাশয় কিছু ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। নীলাচলে বসিয়া নদীয়ার ভক্তবৃন্দের আনীত দুই শত লোকের ভোজ্যবস্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিনেই ভোজন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্ত যে তিন সের মধু খাইয়া হজম করিবেন, ইহাতে আর বিস্ময় কি ?

বাবাজি মহাশয়ের শিষ্য। এইরূপ জন শ্রুতি আছে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয়ের আর একটি মন্ত্রশিষ্য গুরুদত্ত নাম শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ দাস। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে জাতিতে চর্ম্মকার ছিলেন। এই নীচ জাতিকে বাবাজি মহাশয় দীক্ষামন্ত্র দিয়াছিলেন বলিয়া তাৎকালিন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া নাপিত বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বাবাজি মহাশয়কে কিছুদিন দাড়ী গোঁপ রাখিতে হইয়াছিল। একদিন পথে তাঁহার সহিত নবদ্বীপের পরলোকগত প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণির সাক্ষাৎ হইলে তিনি এইরূপ দাড়ী গোঁপ রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বাবাজি মহাশয় সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, তখনই শিরোমণি মহাশয় একজন নাপিত ডাকাইয়া তাঁহার ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন তিনি ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানেন না। শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় তাৎকালিন নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তিনি বাবাজি মহাশয়কে ক্ষৌর কর্ম্মান্তে সেই জলে সেখানেই স্বয়ং ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা করিয়া দেখাইলেন. চর্ম্মকার শিষ্য করিয়া বাবাজি মহাশয় কুকর্ম্ম করেন নাই। তখন নবদ্বীপের অন্যান্য ক্ষুদ্রমনা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের চৈতন্য হইল, তাঁহারা এই অপকর্ম্মের জন্য বাবাজি মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব অলৌকিক লীলা। "কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা" শ্রীচৈতন্য ভাগবতোক্ত এই বাক্য সার্থক করিবার জন্য সিদ্ধ

বাবাজি মহাশয় মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিক লীলারঙ্গ করিতেন। সাধু বৈষ্ণবগণ কখন অলৌকিক কার্য্য করেন না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কিছু কিছু ঐশ্বর্য্য না দেখাইলেও চলে না। এরূপ একটি কার্য্যে সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় একদিন গঙ্গার ঘাটে কিছু ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, সে সময়ে কলিকাতা হইতে মধ্যে মধ্যে জাহাজে মুরশিদাবাদে গোরা-সৈন্য যাতায়াত করিত। এই জাহাজ নবদ্বীপ হইয়া যাইত। গঙ্গা তখন প্রশস্ত এবং বহতা ছিলেন। একদিন এরূপ একখানি গোরা-সৈন্যপূর্ণ জাহাজ নবদ্বীপের স্ত্রীলোকদিগের স্নানের ঘাটে আসিয়া নোঙ্গর করিল, এবং কয়েকজন গোরা সেই ঘাটে নামিল। নদীয়ার কুলবধূগণ সেই ঘাটে তখন স্নান করিতেছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে একটি উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশীয়া সুন্দরী বিধবা যুবতী ছিলেন। কুলস্ত্রীগণ গোরা দেখিয়া সকলে ভয় পাইয়া পলায়মানা হইলেন। কিন্তু দু'একটি দুর্বৃত্ত গোরা-সৈন্য তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে উদ্যত হইল। সিদ্ধবাবাজি মহাশয় স্ত্রীলোকের ঘাটেই নিত্য স্নান করিতেন এবং নদীয়াসুন্দরীগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন এক্ষণে এই কুলবধূগণ বাবাজি মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। বাবাজি মহাশয় তখন শৌচ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া কমণ্ডলু মাজিতেছিলেন। তিনি সেই কমণ্ডলু হস্তে গোরাদ্বয়ের সম্মুখীন হইয়া ক্রোধে কম্পবান কলেবরে কি বলিলেন এবং সেই কমণ্ডলুর জল তাহাদের মুখে ছিটাইয়া দিলেন। ইহাতে তাহারা অন্ধ প্রায় হইয়া মহা শঙ্কিত হইয়া অতি কষ্টে জাহাজে ফিরিয়া গেল। জাহাজ সে স্থান পরিত্যাগ করিল। বাবাজি মহাশয় স্নানান্তে এই বলিয়া নিজ ভজনমন্দিরে চলিলেন "ওরে দুর্বৃত্ত! এই নদীয়াসুন্দরীগণ নদায়া-নাগরী। ইহাঁরা আমার প্রাণবল্লভের একান্ত অনুগতা; ইহাঁরা গৌর ভোগ্যা তোদের সাধ্য কি ইহাদের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিস্।"

বাবাজি মহাশয়ের এই অলৌকিক লীলারঙ্গ নদীয়ার সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়ের আর একটি অলৌকিক লীলা এস্থলে বর্ণনা করিয়া আত্মশোধন করিব। নবদ্বীপে রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য নামে একজন বৈষ্ণবদ্বেষী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ঘোর শাক্ত ছিলেন। তিনি একদিন কুবুদ্ধিতে বাবাজি মহাশয়ের গাত্রে ছাগরক্ত দিয়াছিলেন। কিন্তু বাবাজি মহাশয় ইহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া বহির্বাস পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইয়া ভজন কুটীরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু—

ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণের স্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে। চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্যে—

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারো॥ চৈঃ চঃ

কাজেই রুদ্রকণ্ঠের সেই দিন ভীষণ বিসূচিকরোগ হইল। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা পুত্রের এই কুকার্য্যের কথা শুনিয়াছেন, এবং এই কুকার্য্যের ফলে যে এই বিপদ হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিয়া দৌড়িয়া গিয়া সিদ্ধবাবাজির চরণে পড়িলেন। তিনি অকপটে উদ্ধত পুত্রের কুকর্ম্মের জন্য কত অনুতাপ, কত ক্রন্দন করিলেন। বাবাজিমহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দয়া প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সসন্মানে উঠাইয়া মধুর বচনে কহিলেন "কোন ভয় নাই, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের চরণে আপনার এই পুত্রটিকে সমর্পণ করুন। তিনি তাঁহাকে কৃপা করিবেন।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া গৃহে আসিয়া দেখিলেন রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ তাহার পুত্রের জীবনশক্তি পুনরুদিত হইয়াছে। ক্রমে দুই চারি দিনের মধ্যে রুদ্রকণ্ঠ এই ভীষণ ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। তাহার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া আসিয়া সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়ের চরণে সমর্পণ করিলেন।

কথিত আছে এই রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে বাবাজি মহাশয় কৃপা করিয়াছিলেন। এবং গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এই রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের পুত্র ৺মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কিরূপে বাবাজি মহাশয়ের কৃপায় পরম গৌরভক্ত হইয়াছিলেন।

কদন্ন ভিক্ষা। সিদ্ধবাবাজি মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে বাসকালীন অন্যত্র কুত্রাপি ভিক্ষা করিতেন না। কেবল শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসবে শ্রীনিত্যানন্দমন্দিরে তাঁহাকে প্রসাদ গ্রহণ করিতে কেহ কেহ দেখিয়াছেন এরূপ শুনা যায়। একদিন একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়কে তাঁহার কুটিরে ভিক্ষা করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন,—বাবাজি মহাশয় প্রথমেই অতি বিনীতভাবে এই নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিলেন, কিন্তু যখন সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণবটি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বড়ই জিদ করিতে লাগিলেন তখন স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রাণনাথের বাল্যভোগের প্রসাদ কিছু পাইয়া তবে ভিক্ষায় গেলেন। যথা সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ লাগিল—বাবাজি মহাশয়ের প্রসাদ তাঁহার কুটীরে আসিল,—কিন্তু তিনি সেখানে নাই। সকলেই তখন তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। প্রসাদ তাঁহার জন্য তাঁহার কুটিরে সযত্নে রক্ষিত হইল। সেদিন অপরাহ্নে যখন সেবাইত গোস্বামীগণ শ্রীমন্দির প্রাঙ্গনে একত্রিত হইয়াছেন, তখন বাবাজি মহাশয় ভিক্ষা করিয়া মন্দিরে ফিরিলেন। সকলেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘বাবাজি মহাশয়! আজি কোথায় ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন”। সিদ্ধবাবাজি মহাশয় নিরুত্তর—তাঁহার বদন মলিন—অবনত মস্তক। নয়নে ধারা পড়িতেছে,—যেন কোন বিশেষ অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। সেবাইত গোস্বামীগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ব্যথিতচিত্তে বাবাজি মহাশয়কে বারম্বার

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন 'বাবাজি মহাশয় ! কি হইয়াছে বলুন,— আপনি কেন এরূপ কাতর হইতেছেন ?" তখন সজল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি করযোড়ে সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, 'প্রভুগণ ! কি আর বলিব ? এই বৃদ্ধ বয়সে আজ আমার মনে কামভাবের উদ্দীপনা হইয়াছে—আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" তখন একজন প্রাচীন গোস্বামী পাদ বিস্মিত হইরা জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবাজি মহাশয় ! আপনি আজ নিশ্চয়ই পাপন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন—কোথায় আজ আপনার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল ?" বাবাজি মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে তখন সেই বৈষ্ণবটির নাম করিলেন এবং তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেবাইত গোস্বামীর অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল সেই বৈষ্ণবটি স্ত্রীসঙ্গী এবং তাহার অন্ন দুষ্ট-অন্ন। এই স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ-প্রভাবে এবং তাহার দত্ত দুষ্ট-অন্ন গ্রহণে যে বাবাজি মহাশয়ের মন দুষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? বাবাজি মহাশয়কে প্রবোধ দিয়া সকলে কহিলেন "বাবাজি মহাশয় ! আপনি মহাপ্রভুর প্রসাদ আজ পান নাই—সেই জন্যই এরূপ হইয়াছে—যান প্রসাদ গ্রহণ করুন, সমস্ত পাপ দূর হইয়া যাইবে।" বাবাজি মহাশয় তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে নিবেদন করিলেন, —"প্রাণনাথ ! পতিতপাবন ! তুমি আমাকে দয়া কর ! আমার প্রাণ গেল ! আর আমি এমন কাজ কখনও করিব না—এই তোমার সম্মুখে নাকে কাণে ক্ষত দিলাম" এই বলিয়া তিনি প্রাঙ্গনে পড়িয়া দশহাত নাকে খত দিলেন। কদন্ন বা পাপান্ন গ্রহণে সিদ্ধ মহাপুরুষদিগেরও যখন মন কলুষিত হয়,—বুদ্ধির নাশ হয়, তখন অন্যপরে কা-কথা ! স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ যখন নিষিদ্ধ, তাহার অন্ন গ্রহণ মহাপাপ,—পাপান্ন ঠাকুর গ্রহণ করেন না।

গুরু, গৌরাঙ্গ ও গঙ্গাপ্রীতি। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয়ের অদ্ভুত গুরুভক্তি ছিল। "শ্রীগুরু" শব্দটি তাঁহার সম্মুখে যদি

কেহ উচ্চারণ করিতেন, তিনি প্রেমানন্দে শ্রীগুরুর গুণকীর্ত্তনে আত্ম-হারা হইতেন। তিনি বলিতেন গুরু, গৌরাঙ্গ ও গঙ্গা শ্রীধাম নবদ্বীপে বসিয়া যিনি একত্রে ভজন করিতে পারেন, তাহার মত সুকৃতিবান লোক জগতে নাই। বাবাজি মহাশয় গুরুপূর্ণিমার দিন ভজনকুটীরে বসিয়া অহোরাত্র শ্রীগুরুনাম জপ করিতেন,—সে দিন তাঁহার অন্য কৃত্য থাকিত না।

তিনি দিনে তিনবার গঙ্গাস্নান করিতেন, প্রত্যেক বারেই তাহার ভজনকুটীর হইতে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে গঙ্গাতীরে যাইতেন এবং যথারীতি গঙ্গা বন্দনা করিয়া তবে অবগাহন করিতেন। অবগাহনের পর পুনরায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে তবে মন্দিরে তাঁহার ভজন কুটীরে আসিতেন। গঙ্গাতীরে বসিয়া বহুক্ষণ তিনি ভজনানন্দে অতিবাহিত করিতেন,—গঙ্গার মহিমা গান করিতে তিনি শতমুখ হইতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি নিম্ন-লিখিত গঙ্গাস্তুতি তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া কীর্ত্তন করিতেন।

"প্রেমরস স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
সকৃত তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণুভক্তি হয় কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার প্রসাদে সে "কৃষ্ণ" হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন॥
কীট পক্ষী শৃগাল কুকুর যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের উপমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর॥

বাবাজি মহাশয়ের গঙ্গাভক্তি অতুলনীয় ছিল। তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সেও দিনে তিনবার গঙ্গাস্নান না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

নদীয়া নাগরী-ভাবে—গৌরাঙ্গ ভজনের শেষ প্রবর্ত্তক সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয়। তিনি সর্ব্বসমক্ষে সর্ব্বদাই বলিতেন—

"গৌরাঙ্গের (১) কান্তা আমি, কান্ত মোর গোরা।
আমার ভজন হ'ল সারা॥

এই ভাবটি বাবাজি মহাশয়ের নিজস্ব ভাব ছিল। তাঁহার নাগরী-ভাবের গৌরাঙ্গভজন অপূর্ব্ব দৃশ্য ছিল,—সর্ব্বসমক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে তিনি প্রকাশ্যভাবে স্ত্রীলোকের বেশভূষণে ভূষিতা হইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহকে প্রাণবল্লভ সম্বোধন করিয়া তাঁহার সহিত কত কি রস কথা কহিতেন। তিনি অধিকারী গৌরভক্তগণকে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাগরী-ভাবের উপদেশ দিতেন। তখন তাঁহার এই নাগরী-ভাবের ভজনের কেহই বিরোধী হয়েন নাই। গৌরধামগত মাহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় বলিতেন "বাবাজি মহাশয়ের ভজনাদর্শ অনুগমন করিয়া যদি নরকেও যাইতে হয় তাহাও পরম মঙ্গল মনে করি"।

প্রসঙ্গতঃ শিশির কুমারের সহিত বাবাজির প্রথম মিলনের মধুময় কাহিনীর কিঞ্চিৎ আভাস না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই ঘোষ পরিবারের প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষিত। দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য শিশির কুমার কিছুদিন বিলাতে অবস্থান করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া তাঁহার তৃপ্তি না হওয়ায় তিনি পুনঃবার স্বদেশে আগমন করিয়া ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ তাঁহার মনে রেখা পাত করিতে না পারায়, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীহেমন্ত কুমার ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত অচিন্ত ভেদাভেদবাদ পাঠানুশীলন করেন। হেমন্ত

(১) পঠান্তর 'নদের চাঁদের'

বাবু মহাপ্রভুর কৃপায় পূর্ব্ব হইতেই ভক্তি মার্গানুরাগী এবং একজন বিশিষ্ট গৌরভক্ত ছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রমী হইয়াও মনে প্রাণে ভেকাশ্রয়ী বৈষ্ণবের কঠোরতা পালন করিতেন। তখনও "অমিয় নিমাই চরিত" লেখা আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু হেমন্ত বাবুর কৃপায় শিশিরকুমারের হৃদয়ে ভক্তি বীজ রোপিত হওয়ায় শিশির কুমার ভক্তি পথ যাত্রী। শ্রীগৌর দর্শনের উৎকণ্ঠা লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপের গঙ্গারঘাটে আসিয়াই এক জ্যোতির্ম্ময় বৈষ্ণবের দর্শন করেন এই বৈষ্ণবই আমাদের সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহারাজ। দর্শন মাত্রেই শিশির কুমারের হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদয় হয়। তিনি অতি দৈন্য ভরে বাবাজি মহাশয়ের সম্মুখে যাইয়া ভূলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। পরে অতিশয় বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করেন "কিরূপে প্রেমভক্তি হয়?" বাবাজি উত্তর করেন "দুই পয়সায় প্রেমভক্তি হয়।" উত্তরের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শিশির কুমার বলেন "আপনি কি আমাকে ঠাট্টা করিলেন? আমি আতি অধম। আমি অন্তরের সহিতই আপনাকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম।" বাবাজি বলেন "না, আমি কখনও ঠাট্টা করি না, আমি যাহা বলিয়াছি, সম্পূর্ণ সত্য। কলিকাতার বটতলা হইতে দুই পয়সা দিয়া 'শ্রীনরোত্তম প্রার্থনা' কিনিয়া পড়, তাহা হইলেই তুমি প্রেমভক্তির সন্ধান পাইবে। অতঃপর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শিশির কুমার বাবাজি মহাশয়ের আদেশানুযায়ী দুই পয়সায় 'শ্রীনরোত্তম প্রার্থনা' কিনিয়া প্রথমেই দেখেন।

"গৌরাঙ্গ" বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে ক'বে নয়নে ব'বে নীর ॥
আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে ॥

ইহা পড়িয়াই শিশির কুমারের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আলোড়ন হয়। কারণ 'গৌর' নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুকম্প পুলকাদি

অঙ্গে প্রকাশ পায়—এইরূপ কথা আর পূর্ব্বে তিনি কোনও গ্রন্থে দেখেন নাই। কিন্তু 'গৌর' নাম উচ্চারণ করা সত্ত্বেও তাঁহার দেহে ঐরূপ অশ্রুকম্প পুলকাদি প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়া তিনি শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুরের লেখায় সন্দিহান হ'ন। সেই সন্দেহের অবসান কল্পে পরে আবার বাবাজি মহাশয়ের স্মরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে বাবাজি মহাশয় উত্তর করেন, "অনেক জন্মের ময়লা মাটির আবরণে সোনার উজ্জ্বলতা ঢাকা পড়িয়া আছে। সোনার যেমন উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়না 'গৌর' নামও তেমনি বিফলে যায় না। 'গৌর' নামই ঐ ময়লা মাটি ধুইয়া নামের স্বরূপ হৃদয়ে জাগাইয়া অষ্ট স্বাত্তিক ভাবভূষণে শ্রীঅঙ্গকে বিভূষিত করে। ইহাই 'শ্রীগৌর' নামের ধর্ম্ম। তোমার ভিতরে সোনা আছে, কেবল ময়লা মাটির আবরণে উহার উজ্জ্বলতা ঢাকা আছে—'গৌর' নাম করিলেই দেখিবে শ্রীপাদ নরোত্তমের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য"। বলা বাহুল্য ইহার পরই শিশির কুমার 'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থ লেখেন। ঐ গ্রন্থে তিনি কত প্রেম ও আর্ত্তি সহকারে কত—অশ্রুজলে "শ্রীগৌরাঙ্গ" লীলা লিখিয়াছেন তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। গ্রন্থের এমনই বৈশিষ্ট—প্রেমের এমনই সঞ্চারী শক্তি যে ঐ গ্রন্থ পাঠে পাঠকের পর্য্যন্ত অশ্রুকম্প পুলকাদি প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। সেই জন্যই শিশির কুমার আজ বৈষ্ণব সমাজের এক জন মহাত্মা। এই সবই সিদ্ধ বাবাজি মহারাজের কৃপা। সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়ের রচিত একটি পয়ার শ্লোক তাঁহার পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে আমরা পাইয়াছি। সেটি এই—

"শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নাগরীর প্রাণ।
লক্ষী বিষ্ণুপ্রিয়াপতি ব্রজপ্রেম ধাম॥
জনমে জনমে মুঞি নদীয়া নাগরী।
মোর প্রাণনাথ শ্রীনাগর গৌরহরি॥"

ঠাকুর লোচনদাস কৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলেও দেখিতে পাই— যখন শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীগর্ভে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর উদয় হন, তখন নদীয়ার কুলস্ত্রীগণ শিশুগৌরাঙ্গকে জননীর ক্রোড়ে প্রথম দর্শন করিয়াই বলিয়াছিলেন—এই অপূর্ব্ব শিশুটি **"নাগরীর প্রাণ"** যথা—

দেখিতে দেখিতে সভার জুড়াইল নয়ন।
সভার হৈল মনে এই নাগরীর প্রাণ॥
এ হেন বালক কভু নাহি দেখি শুনি।
মানুষের হেন ঠাম না দেখিয়ে কিছু।
দিব্য বিলাসিনী কহে জানিব ইহা পিছু॥

মহাজনবাক্যে রসরাজ রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আবির্ভাব দিবসেই তাঁহার নাগরত্ব ও রসরাজত্ব প্রকটিত হইল,—এবং এই নাগরত্ব ও রসরাজত্বই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া গোস্বামীশাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিত।

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির তিরোভাব। শেষ বয়সে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয় শ্রীধামেশ্বর মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে কোথাও যাইতেন না,—শ্রীখণ্ডে অতি বৃদ্ধ বয়সে শেষ একবার গিয়াছিলেন যখন, তখন শ্রীখণ্ডবাসী ঠাকুরসন্তানগণ তাঁহাকে বহু আদর ও সন্মান করিয়া সেখানে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বাবাজি মহাশয় তাঁহাদের সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—"শেষের দিনে আমার নবদ্বীপ ধাম ছাড়িয়া কোথাও থাকিব না,—নয়নে নয়ন মিলাইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভের বদনকমল দেখিতে দেখিতে আর মুখে—

"শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোর চন্দ্র!
শ্রীনাথ-বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র!
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর!
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!"

এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আমি তাঁহার ধামে,—তাঁহার শ্রীমন্দিরে বসিয়া তাঁহারই সম্মুখে দেহত্যাগ করিব। মহাপুরুষের যে বাক্য সেই কাজ,—এই ভাবেই সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় একশত বৎসরের অধিক বয়সে বাং ১২৮৪ সালে শ্রীধামে দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধান লীলা অপূর্ব্ব,—তাঁহার মহাপ্রয়াণ-লীলা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বর্ণিত হইল।

একদিন অপরাহ্নে বৃদ্ধ বাবাজি মহাশয় মহাপ্রভুর সেবাইত-গোস্বামীগণকে নিকটে ডাকিয়া মৃদুমধুরস্বরে কহিলেন,—"আমার প্রাণবল্লভ আমাকে ডাকিতেছেন,—তোমরা সকলে তাঁহার নিজজন,—আমাকে প্রফুল্লমনে বিদায় দাও,"—গোস্বামীপ্রভুগণ এই কথার মর্ম্ম তখন কিছু বুঝিতে পারিলেন না—কোন বিশেষ উত্তরও দিলেন না। বাবাজি মহাশয় যথারীতি মহাপ্রভুর সন্ধ্যা আরতি দর্শন করিয়া নিজ ভজন কুটিরে গিয়া শয়ন করিলেন। তিনি ভজনানন্দেই আছেন,—মৃদু মৃদু নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন—দুই নয়নে প্রেমাশ্রুধারা পড়িতেছে,—কখন কখন উচ্চৈঃস্বরে "হা বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ! হা প্রাণবল্লভ! হা গৌরাঙ্গ গুণনিধি!" এই বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কেবলমাত্র দুটি কথা বলিতেছেন "আমি স্বামী-বিরহ-পীড়িত"। সখি এবং প্যারীমাতা দুই ভগিনী বাবাজি মহাশয়ের কুটিরাভ্যন্তরেই আছেন,—তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন। মহাপ্রভুপাড়ায় সকলেই খবর পাইলেন সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় পীড়িত,—স্ত্রী বৃদ্ধ আবাল বণিতা সকলেই তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। মা গোস্বামিনীগণ এবং কুলবধুগণ সকলেই মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে আসিলেন। দেখিতে দেখিতে বাবাজি মহাশয়ের পীড়ার কথা সমগ্র নবদ্বীপে রাষ্ট্র হইল। নবদ্বীপসুদ্ধ লোক মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। অগ্রহায়ণ মাস,—পূর্ণিমা তিথি,—

সন্ধ্যাকাল, নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে আসিয়াছেন। বাবাজি মহাশয়ের আসন্নকাল উপস্থিত, এই কথা শুনিয়া নবদ্বীপের তৎকালিন বড় বড় পণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সকল তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, কারণ সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতেন, এবং সকলেরই তিনি পরিচিত ও প্রিয় ছিলেন। সকলের সঙ্গেই তিনি সেদিন অল্পবিস্তর কথা কহিলেন,—সকলকেই বলিলেন,—"আজ আমি যাত্রা করিয়া রহিব—কাল প্রাণবল্লভের নিকট যাইব"। এইভাবে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল,—অনেকে গৃহে ফিরিলেন,—বহুলোক শ্রীমন্দিরেই রহিয়া গেলেন। প্রাতে শয্যা হইতে বাবাজি মহাশয় স্বয়ং উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার হস্তে জপমালা,—মধ্যে মধ্যে মুখে "হা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ! হা গৌরাঙ্গ! এই নাম। চক্ষুদ্বয় কখন মুদ্রিত,—কখন ভাবাবেশে উন্মিলিত। যাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছেন, তাঁহাকেই বলিতেছেন "প্রাণনাথ আমাকে ডাকিতেছেন,—তোমরা তাঁহার নিকট আমাকে লইয়া যাও। সেবাইত-গোস্বামীগণ এই কথা শুনিয়া সকলে মিলিয়া বাবাজি মহাশয়কে তাঁহার ভজন-কুটির হইতে মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে নাটমন্দিরে লইয়া গেলেন। সেখানে একখানি খাটে তাঁহাকে সাবধানে বসাইয়া দেওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে শ্রীমন্দিরে বহু ভক্তের সমাগম হইল,—প্রভাতী সঙ্কীর্ত্তনে মন্দির মুখরিত হইল। বাবাজি মহাশয় মালা হাতে করিয়া সেই খাটিয়ায় বসিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভকে অনিমেষ নয়নে দর্শন করিতেছেন,—আর তাঁহার সহিত কত প্রাণের কথা কহিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি উপস্থিত ভক্তবৃন্দের সহিতও অল্পবিস্তর কথা কহিতেছেন—এই রূপে সেদিনও বেলা দ্বিপ্রহর প্রায় গত হইল,—মহাপ্রভুর ভোগ হইল—যৎসামান্য প্রসাদ বাবাজি মহাশয় সেই খাটে বসিয়াই পাইলেন। তাহার পর সকল ভক্তগণ মিলিয়া শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বাবাজি মহাশয়কে পরিক্রমা

করিয়া বেড়াকীর্ত্তন আরম্ভ হইলে,—তিনি প্রেমানন্দে হাত তুলিয়া "গৌর হরি-বোল" বলিতে লাগিলেন। তারপর করযোড়ে অতি বিনীত ভাবে সকলকে কহিলেন "তোমরা আমার পরম বান্ধব। আমার এই শেষ সময়ে আমাকে হরিনাম শুনাইয়া কৃতার্থ করিলে। তোমাদের সকলের চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত"। এই বলিয়া তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া মৃদুমন্দ স্বরে স্বরচিত পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন যথা,—

"আমার ভজন হ'ল সারা, আমার সাধন হ'ল সারা।
গৌরের (১) কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা॥

এবং সকলকে বলিলেন এখন এই পদই কীর্ত্তন কর। তখন সকলে মিলিয়া এই পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গন মুখরিত হইল,—সেখানে প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিল। সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় স্থির নেত্রে তাঁহার প্রাণবল্লভের নয়নে নয়ন মিলাইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন। এখন তিনি শয়ান,—খাটে শয়ন করিয়া মৃদুমন্দ কীর্ত্তন করিতেছেন। এমন সময়ে প্রাচীন সেবাইত গোস্বামীগণ আসিয়া মহাপ্রভুর চরণামৃতে সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়ের অভিষেক করিলেন, চরণতুলসী তাঁহার বদনে দিলেন,—মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র একখানি তাঁহার মস্তকে বাঁধিয়া দিলেন,— শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবারের সকল গোস্বামীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন,—প্রিয়াজিগণ সকলকে একত্রে দেখিয়া তাঁহার বড় মনে আনন্দ হইল—তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাদের পদধুলি চাহিলেন,—সকলের চক্ষেই প্রেমাশ্রুধারা,—সকলেরই বিষণ্ণবদন। বাবাজি মহাশয়ের

(১) পাঠান্তর 'নদের চাঁদের'

সহাস্যবদন,—প্রেমপরিপ্লুত সতেজ দৃষ্টি,—তিনি ক্ষীণকণ্ঠে পুনরায় তাঁহার স্বকৃত পদ ধরিলেন,—

আমার ভজন হ'ল সারা।

তোরা বলগো ধনি। আমার সাধন হ'ল সারা॥
গৌরের (২) কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা"।

তখন পুনরায় সকলে মিলিয়া এই পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বাবাজি মহাশয় পরমানন্দে কীর্ত্তন শুনিতেছেন, আর নির্নিমেষনয়নে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন। মৃদুমন্দ স্বরে তিনি কত কথাই তাঁহার প্রাণনাথকে বলিতেছেন,—একটি কথা সেবাইতগোস্বামীগণের কানে গেল "প্রিয়াজিগণে নাথ! সুখে রেখ"। আর একটি কথা আর কেহ শুনিলেন, "গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলসেবা সর্ব্বত্র প্রকাশ—কর"॥

কীর্ত্তন অবিশ্রান্ত চলিতেছে। বাবাজি মহাশয়ের কথা আর কেহ শুনিতে পাইতেছেন না। গগনভেদী কীর্ত্তনধ্বনিতে শ্রীমন্দির মুখরিত,—নবদ্বীপসুদ্ধ লোক আজ একত্রিত হইয়াছে। এমন সময়ে বাবাজি মহাশয় ইঙ্গিত করিয়া একজন গোস্বামীসন্তানকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন,—'আর বেশী বিলম্ব নাই,—আমাকে এস্থান হইতে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইও না,—প্রাণবল্লভের সম্মুখেই আমি এই দেহ বিসর্জ্জন করিব,—আমার শবদেহের সৎকার করিও গঙ্গাতীরে,—আর আমার অস্থি লইয়া আমার প্রাণনাথের শ্রীমন্দিরে আমার সমাধি দিও"। এতগুলি কথা সুস্পষ্টরূপে কহিতে দেখিয়া সকলেই ভাবিলেন, এখনও মৃত্যুলক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই,—বৈদ্য ডাকাইয়া রোগীর হাত দেখান এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে,—এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপের প্রধান কবিরাজ শ্রীরাম বৈদ্য সেখানে

(২) পাঠান্তর 'নদের চাঁদের'

উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাবাজি মহাশয়ের হাত দেখিয়া বলিলেন "মৃত্যুর লক্ষণ ত কিছুই দেখি না"—তখন সকলে মিলিয়া বাবাজি মহাশয়কে ঔষধ খাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন! তিনি ক্ষীণ-স্বরে কহিলেন—'আমার আর বিলম্ব নাই,—প্রাণনাথের চরণামৃত দাও" এই বলিয়া "হা বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ! বলিতে বলিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অষ্টসাত্বিক-ভাবের উদ্গম হইল,—মুখে অপূর্ব্ব তেজপুঞ্জ লক্ষিত হইল,—তিনি ইঙ্গিতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন,—পুনরায় উচ্চরোলে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল,—সেই তাঁহার স্বকৃত পদ—

"গৌরের (৩) কান্তা আমি কান্ত আমার গোরা।
আমার ভজন হ'ল সারা॥

এই মহাসঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে বাবাজি মহাশয় তাঁহার প্রাণবল্লভের নয়নে নয়ন লিপ্ত করিয়া "হা বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ! বলিতে বলিতে গৌর-ধামে গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে উচ্চ হরিধ্বনি উঠিল,—সর্ব্বলোক প্রেমানন্দে প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিল। সর্ব্বলোকে স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্মিত হইল,—

"মৃত্যু নিল পদধুলি ভৃত্য সম এসে"

৩৯২ গৌরাব্দে বাং ১২৮৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজির তিরোভাব হয়।

গঙ্গাতীরে সিদ্ধবাবাজির শবদাহ। ৩৯২ গৌরাব্দের অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা নবদ্বীপ-বাসীর একটী স্মরণীয় দিন। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি এই দিনে পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গৌরধামে গমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপসুদ্ধ লোক,—ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, শাক্ত বৈষ্ণব সেদিন সকলে ধামেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে একত্রিত হইয়া সিদ্ধবাবাজি মহাশয়ের শবানুগমন করিয়াছিলেন,—লোকসংহট্ট মধ্যে ফুলের মালা ও চন্দনের বৃষ্টি হইয়াছিল,—গৌরহরি

---

(৩) পাঠান্তর 'নদের চাঁদের'

'বোল' রবে নদীয়া গগন মুখরিত হইয়াছিল। চৌদ্দমাদল মহাসঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং গোস্বামীপ্রভুসন্তানদিগকে পুরোভাগে করিয়া যখন সিদ্ধ বাবাজিমহাশয়ের শবদেহকে সিংহাসনে তুলিয়া পুষ্পমালা ও চন্দনে ভূষিত করিয়া শ্রীমন্দির হইতে পথে বাহির করা হইল, তখনকার করুণদৃশ্য ভাষায় বর্ণনার অতীত,—চক্ষে অশ্রুধারা পড়িয়াছিল না এমন লোকই দেখা যায় নাই,—মহাপ্রভুর সেবাইত গোস্বামী প্রভুগণের নয়নের জলে বক্ষ ভাসিয়া গিয়াছিল,—গোস্বামীনীগণ এবং কুলনারীবৃন্দ বদনে বস্ত্র দিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিয়াছিলেন।

সমগ্র সহর পরিভ্রমণ করিয়া মহাসঙ্কীর্ত্তনসঙ্গে যখন সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়ের শবদেহকে গঙ্গাতীরে শ্মশানঘাটে আনয়ন করা হইল, তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। স্তুপাকার চন্দনকাষ্ঠ পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছিল। চৌদ্দমাদল বেড়াসঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে সিদ্ধবাবাজি মহাশয়ের পাঞ্চভৌতিক দেহের সৎকার করা হইলে স্বর্ণকৌটায় করিয়া তাঁহার পবিত্র অস্থিখণ্ড সমাধির জন্য শ্রীমন্দিরের বৈষ্ণবখণ্ডে আনীত হইল। নবদ্বীপবাসীর সকল শ্রেণীর লোকের আজ বদন মলিন,—সকলেই যেন পিতৃমাতৃ-বিয়োগ দুঃখে শোকাকুল। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রাঙ্গন যেন শূন্য বোধ হইল! সকলের মুখেই হাহাকার—একই কথা "এমন বাবাজি আর নাই—হবে না,—এমন বৈষ্ণব আর দেখি নাই,—দেখিব না। হায় হায়! এমন মানুষ জন্মে নাই,—আর জন্মাইবেও না। আমারা দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্ম্ম বুঝিলাম না। এমন সোনার মানুষের আদর করিলাম না!"

সমাজ। সিদ্ধবাবাজি মহাশয়ের অস্থিখণ্ড ধামেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের বৈষ্ণবখণ্ডে একটি নিভৃত স্থানে পরম ভক্তিসহকারে মহামহোৎসবের সহিত সমাহিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী পত্রিকার ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যার "শুভসংবাদ" প্রবন্ধে জানিতে পারি যে তাঁহার অস্থির কিয়দংশ শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রেরিত হইয়া সেখানেও

সমাধি রচিত হয়। এই ঘটনায় বাবাজি মহারাজের অলৌকিক প্রভাবও দৃষ্ট হয়। সিদ্ধ বাবার এক শিষ্য শ্রীগৌর শিরোমণি তখন ব্রজধামে ভজন করিতেন! প্রাপ্তির দিন রাত্রে বাবা শ্রীগৌর শিরো-মণিকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলেন—"আমি বৃন্দাবনেও আসিয়াছি"। পরদিন প্রত্যূষে শিরোমণি মহাশয় তাঁহার ভজন কুটিরের দ্বার খুলিয়া দেখেন মহাতেজোময় মূর্ত্তিতে সিদ্ধবাবা ঐ ঘরে উপবিষ্ট আছেন। বাবার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে শিরোমণি মহাশয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ইহার কয়েকদিন পরেই উথলী নিবাসী শ্রীমদ্বৈত সন্তান প্রভুপাদ শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় সিদ্ধবাবার অস্থি কৌটার মধ্যে রাখিয়া গলায় ঝুলাইয়া শিরোমণি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হ'ন। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীধামের বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ, পরমানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে মহারাজের সমাজ নির্ম্মাণ কার্য্যে যোগ দেন। তদ-বধি সেই সমাধিও বিদ্যমান আছেন" শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ সমাধি সিদ্ধ-বাবার শিষ্যা প্যারী ও সখিমাতা তাঁহাদের পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটে সম্পূর্ণ ভার লইয়া যথারীতি সেবা আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ব-মত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ আনিয়া নিত্য বাবাজি মহাশয়ের ভোগ হইত। নবদ্বীপবাসী সাধুবৈষ্ণব এবং সজ্জনগণ এই সমাজ সেবা-কার্য্যে সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্যারী ও সখিমাতা দুইজনেই প্রাচীনা ছিলেন,—কিছুদিন পরে সখিমাতা গৌর-ধামে গমন করিলেন,—একা প্যারী রহিলেন। তাঁহার দ্বারা সুসৃঙ্খলা-রূপে সমাজ-সেবার সকল কাজ সমাধা হইতে পারে না—সেবাইত গোস্বামীগণ বুঝিলেন উপযুক্ত অন্য লোকের প্রয়োজন। সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজিকে শ্রীমন্দিরে স্থান দিয়া তাঁহাকে এই সমাজসেবাকার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। গুরুদেবের উপযুক্ত শিষ্য কৃষ্ণদাসবাবাজি,—শ্রীগুরুপাদপদ্মচিন্তা ভিন্ন তিনি অন্য কিছু জানিতেন না,—তিনি সমাজসেবা-ভার পাইয়া মহানন্দে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ভজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাসের গুরুদত্ত নাম

"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদাস",--তুই শিষ্যারও গুরুদত্তনাম "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দাসী"। বৃদ্ধা প্যারীমাতা আরও কিছুদিন জীবিতা ছিলেন। পরে সমস্ত সেবা ভার কৃষ্ণদাস বাবাজির উপর পড়িল। তিনি যথাসাধ্য শ্রীগুরুসেবা করিয়া বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়িলেন,—সমাজ-সেবা কার্য্য আর তাহার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না। সেবাইত গোস্বামী-প্রভুগণের ইচ্ছায় তাঁহার শিষ্য শচীনন্দন বাবাজি সমাজ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। একশত বর্ষ বয়সে কৃষ্ণদাস বাবাজি মহাশয় পৌষ শুক্ল-তৃতীয়াতিথিতে গৌরনাম করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রাঙ্গনে দেহত্যাগ করেন। নদীয়াবাসী বৈষ্ণবগণ তাঁহাকেও মহাসমারোহে সঙ্কীর্ত্তনসঙ্গে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া তাঁহার শেষ কার্য্য সমাধা করেন। তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহারও অস্থিখণ্ড শ্রীগুরুদেবের সমাধি ক্ষেত্রে সমাহিত হয়। শচীনন্দন বাবাজি এক্ষণে সিদ্ধবাবাজি মহাশয়ের বর্ত্তমান সমাজ-সেবক। সম্প্রতি স্বনামধন্য রামদাসবাবাজি মহাশয়ের চেষ্টায় সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয়ের একটি নূতন সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।